বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের অদৃশ্য শত্রু

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

পরমভক্তিভাজন গুরুদেব
ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের শ্রীচরণে

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

জীবাণুমাত্রেই যে আমাদের শত্রু তাহা নহে। অনেক জীবাণু আমাদের শত্রু তো নয়ই, বরং তাহাদের অভাব হইলে শুধু মানবজাতি কেন প্রাণিজগতেরই অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। জীবাণু আণুবীক্ষণিক জীববিশেষ, সেই কারণে তাহারা অদৃশ্য। রোগ-জীবাণু আমাদের অদৃশ্য শত্রু।

অদৃশ্য শত্রুর রাজত্বকাল

মাত্র প্রায় একশত বৎসর হইল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে জীবাণু আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কিন্তু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই অদৃশ্য শত্রু মানবজাতি তথা জীবমাত্রকেই আক্রমণ করিয়া আসিতেছে। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মানব বা কোনও স্তন্যপায়ী জন্তুর আবির্ভাব হয় নাই, যখন (অন্ততঃ দশ কোটি বৎসর পূর্বে) অতিকায় সরীসৃপ ডাইনো-সরাস প্রচুর খাদ্য ভোজন ও বায়ু সেবন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বেড়াইত, তখনও এই অদৃশ্য শত্রু যক্ষ্মাজীবাণু রূপে তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ঐ সময়েরও বহুপূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বহুকোটি বৎসর এই অদৃশ্য শত্রুর ক্ষমতা অপ্রতিহত ভাবে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিদ্যমান।

পুরাকালে মানব কোন্ কোন্ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য বর্তমানে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মিউজিয়মে মিসরদেশীয় মামি (mummy) সুরক্ষিত রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই তিন-চার হাজার বৎসরের পুরাতন। রোয়েন্টগেনরশ্মি (X-ray) দ্বারা কিংবা শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা ঐ সকল মামির মৃত্যুর কারণ এবং অন্য রোগের বিবরণ জ্ঞাত হইবার চেষ্টা চলিতেছে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাইরো ভ্রমণ উপলক্ষে বর্তমান লেখকের ঐরূপ একটি শব-পরীক্ষার সুযোগ হইয়াছিল। এই শবটি হার-মোস (Har-mose) নামক এক মিসরদেশীয় সংগীতজ্ঞের। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৯০ সালে তাহার মৃত্যু হয়। প্রায় ৩৪০০ বৎসর এই মামি একটি পর্বতের গুহায় রক্ষিত ছিল। শব পরীক্ষা করিয়া স্থির করা গিয়াছে, তাহার মৃত্যুর কারণ তরুণ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখা গেল যে তাহার শারীরিক অনেক রকম তন্তু, যথা মাংসপেশী, নার্ভ, শিরা, ফুসফুস, বৃক্ক (kidney), যকৃৎ ইত্যাদি সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে। কেবলমাত্র জীবকোষস্থ মধ্যবস্তু (nucleus) ও লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে এরূপ অনেক মিসরীয় মামি পরীক্ষা করিয়া যক্ষ্মা, বসন্ত ইত্যাদি অনেকপ্রকার জীবাণুজনিত ব্যাধির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

গত একশত বৎসরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যজাতির নিদর্শন স্বরূপ অনেকগুলি আদি মনুষ্যের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বা তাহার অংশবিশেষ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে নিয়েণ্ডারতাল (Neanderthal) মানব, হলটিং (Halting) মানব, জিব্রলটার (Gibraltar) মানব, লা শাপেল (La chapelle) মানব, রোডেসীয় (Rhodesian) মানব, এবং পরিশেষে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ যবদ্বীপের মানব (Java man) সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদিগের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া দন্তরোগ (caries, dental abscess) ও অন্যান্য অনেক রোগের নিদর্শন মিলিয়াছে। ইহারও পূর্বে অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে মানব জন্মগ্রহণ করে নাই, যখন ইহা গুহাবাসী ভল্লুক (cave bear), হস্তী (mammoth), খড়্গদন্ত ব্যাঘ্র (sabre-toothed tiger), বিরাট সরীসৃপ (dino-saurus) ইত্যাদি জন্তুর বাসস্থান ছিল তখনও যে তাহারা রোগাক্রান্ত হইত বর্তমানে প্রাপ্ত তাহাদিগের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সে সাক্ষ্য দেয়।

পণ্ডিতেরা বলেন অতিকায় সরীসৃপ ডাইনোসরাস অন্ততঃ দশ কোটি বৎসর হইল এই পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইরূপ এক সরীসৃপের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের মেরুদণ্ড যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়াছিল দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ যক্ষ্মাজীবাণু অন্ততঃ ১০ কোটি বৎসর এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে বিশেষ প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে এরূপ জীবাণুরও সন্ধান মিলিয়াছে যাহারা তন্মধ্যেই প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে

জীবাণু আমাদের পরম বন্ধু এবং ভীষণতম শত্রু

জীবাণু কাহাকে বলে? নাম অনুসারে জীবাণু এক অতি সূক্ষ্ম অণুপরিমিত আকৃতিবিশিষ্ট জীব। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক হয়। জীবাণুদিগের কতকগুলি আবার এত ক্ষুদ্র যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং ইহাদিগকে অতি-আণুবীক্ষণিক (ultramicroscopic) জীবাণু বলা হয়। সংক্রামক ব্যাধি উৎপাদনকারী জীবাণুগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) ব্যাকটিরিয়া (bacteria)—ইহারা অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ বিশেষ, যথা যক্ষ্মা-জীবাণু। (২) প্রোটোজোয়া (protozoa)—ইহারা আণুবীক্ষণিক এককোষবিশিষ্ট প্রাণীবিশেষ যথা ম্যালেরিয়া-জীবাণু, প্রবাহিকা রোগ (dysentry) উৎপাদনকারী অ্যামিবা ইত্যাদি। (৩) ভাইরাস (viruses)—ইহারা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাণু। ইহারা জল-পরিশ্রুতি-যন্ত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রমধ্য দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। পক্ষান্তরে ব্যাকটিরিয়া ও প্রোটোজোয়া

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া ফিলটারের ছিদ্রমধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে না। ব্যাকটিরিয়া এককোষবিশিষ্ট উদ্ভিদ-জীবাণু এবং রোগ উৎপাদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ব্যাকটিরিয়া এবং প্রোটোজোয়া প্রায় সর্বস্থানেই বিদ্যমান। ছোলার আকৃতি-পরিমাণ একটু মৃত্তিকাতে কয়েক লক্ষ জীবাণু থাকে। আমাদের এইসকল শত্রু এরূপ ব্যাপক-ভাবে অবস্থিত যে ইহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন যে যখন প্রত্যেক জীবদেহের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরপ্রদেশ জীবাণুতে পূর্ণ তখন মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তুর পক্ষে একদিনও বাঁচিয়া থাকা কিরূপে সম্ভবপর? বিশেষতঃ যখন জীবাণুসকলই মহামারী বিস্তারের কারণ।

স্থানীয় (epidemic) কিংবা বিশ্বব্যাপী (pandemic) মহামারী-রূপে রোগসকল বিস্তৃত হইবার ফলে জনসাধারণের মনে জীবাণু-আতঙ্ক (bactrophobia) দেখা যায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবাণু মানবজাতির পরম বন্ধু। বস্তুতঃ মানব কেন, পশু এমনকি উন্নততর উদ্ভিদের পক্ষেও জীবাণু ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুর মধ্য হইতে কেবলমাত্র কয়েকটি দ্বারা রোগোৎপত্তি হয়, যদিও জনপদ ধ্বংসের পক্ষে উহাই পর্যাপ্ত। মানবসমাজে হত্যাকারী অপরাধীর সংখ্যা সমস্ত জনসাধারণের তুলনায় অতি সামান্য, অথচ তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানবসমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই সকল অপরাধীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা ও ইহাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া জনসাধারণের নির্বিঘ্নতা রক্ষা করা যেমন পুলিস-বিভাগের কার্যের অন্তর্গত, সেইরূপ রোগোৎপাদনকারী জীবাণুসকল হইতে জনসাধারণকে রক্ষার বন্দোবস্ত করা জন-স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

কি প্রকারে জীবাণু আমাদের প্রধান বন্ধুর কাজ করে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণের জন্য চাউল আটা আলু এবং অপরাপর ফলমূল শাক-সবজি একান্ত প্রয়োজন। এইসকল উৎপাদনের কার্য ভূমিস্থ জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। কি ভাবে ভূমিস্থ জীবাণু বৃক্ষাদির উৎপাদন এবং বৃদ্ধি ঘটায়, তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে পচন-প্রণালী ও জমির উর্বরাশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য লতাপাতা, শাক-সবজি প্রভৃতি উদ্ভিদ ও মৃত পশুপক্ষীর দেহ ধরণীর বক্ষে নিপতিত হইতেছে। প্রতিদিন মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ী ভর্তি করিয়া যে আবর্জনা স্থানান্তরিত হয় তাহা সমগ্র উদ্ভিদ ও জান্তব আবর্জনাসমষ্টির অতি সামান্য অংশ মাত্র। এতদ্‌ব্যতীত লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও বহু আবর্জনারাশি পড়িয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে এই বিপুল আবর্জনা কিরূপে অপসারিত হইতেছে?

যদি ধ্বংসের কোন পন্থা না থাকিত তাহা হইলে প্রকৃতির এই অপসরণ-কার্যপ্রণালী অচল হইত। জীবাণু কর্তৃক এইসকল অপসরণ কার্য এই আবর্জনা রাশিকে সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত করে। অন্যথা যুগযুগান্ত-ব্যাপী সঞ্চিত আবর্জনায় ধরণীর বক্ষ মৃত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদির স্তূপে পূর্ণ হইত। তুষারমণ্ডিত প্রদেশে অত্যধিক শীতের জন্য জীবাণু সকল নির্জীব কিংবা নিষ্ক্রিয় থাকে, সেইজন্য সেই প্রদেশে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীদিগের পচন হয় না। মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের পচন ব্যতীত যাহাতে উন্নততর বৃক্ষাদি ও জীবদেহ বর্ধিত হইতে পারে তজ্জন্যও জীবাণুই আবর্জনামধ্যস্থিত জৈবিক পদার্থকে (organic matter) ভূমির সারে পরিণত করে।

কি প্রকারে জীবাণু জমিকে উর্বরা করে এক্ষণে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। যখন শস্য উৎপন্ন হয় এবং শাক-সবজি জন্মিতে থাকে তখন তাহারা জমি হইতে তাহাদের বৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করে, সেইজন্য জমিতে খনিজ এবং অন্যান্য জৈবিক পদার্থের ক্রমশঃ অভাব ঘটিতে থাকে। যদি এই অভাব পূরণ না হয়, তবে জমি শীঘ্রই অনুর্বর হয়। কৃষক জমিতে সার দিয়া উহার উর্বরা-শক্তি রক্ষা করে। সারের জৈবিক পদার্থকে জীবাণু বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। সারমধ্যস্থ আমিষ (protein)-জাতীয় পদার্থ অ্যামোনিয়া (ammonia) ও সেলুলোজ (cellulose) এ রূপান্তরিত হয়। শ্বেতসার (carbohydrate) হইতে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া ও কার্বনিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে ইউরিয়া (urea) উৎপন্ন হয়; পরে অক্সিজেন সহযোগে ইউরিয়া বৃক্ষাদির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নাইট্রেটে (nitrate) রূপান্তরিত হয়। জীবাণুর এই কার্য-সম্পাদনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। চাষের দ্বারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিয়া জমিতে অক্সিজেন পরিবেশন করে। নাইট্রোজেনের ন্যায় ফস্‌ফরাস্, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতিও জীবাণুর সহযোগিতায় যথাযথ ভাবে রূপান্তরিত হয়। মটর, শিম, মসূর প্রভৃতি চারাগাছের শিকড়ে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থাকে তাহা জীবাণুতে পূর্ণ। এইসকল জীবাণু বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করে এবং উহা প্রোটিন আকারে মটর, শিম, মসূর প্রভৃতির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে।

ইহাতেই দেখা যায় যে উদ্ভিদজাত বিশেষতঃ খাদ্যজাতীয় উদ্ভিদের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য জীবাণু প্রধানতঃ দায়ী। উদ্ভিদ না জন্মিলে উদ্ভিদ-ভোজী জীবের জীবনধারণ অসম্ভব হইত এবং এইসকল জন্তুর অভাবে মাংসাশী জন্তু এবং পক্ষান্তরে সর্বভুক্ মানবের অস্তিত্বও থাকিত না।

জীবাণু যে শুধু আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক উদ্ভিদ ইত্যাদির জন্মে সাহায্য করে তাহা নহে। আমাদের অন্য প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও কারণ। অনেক শ্রমশিল্পে জীবাণুর প্রয়োজন হয়। ইউরোপবাসীদের প্রধান খাদ্য পাউরুটি জীবাণু না থাকিলে তৈয়ারি করা অসম্ভব হইত। সমগ্র পৃথিবীতে মদ্য একটি পানীয়। ইহাও জীবাণু দ্বারা পচন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। ঘোল, জমাট দুধ, দধি প্রভৃতি এমন কি মাখনের গন্ধও জীবাণুর কার্যফলে উৎপন্ন হয়। পনির, বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য, তামাক, প্রভৃতি সকলই জীবাণুর কার্যফল।

আবার জীবাণু আমাদের খাদ্যদ্রব্য পচনপ্রণালী দ্বারা অখাদ্যেও পরিণত করে। জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদিগকে খাদ্যদ্রব্যাদি পচন হইতে রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। ইহার ফলে দুগ্ধ সম্বন্ধীয় জীবাণুতত্ত্ব, খাদ্যপচননিবারক জীবাণুতত্ত্ব, খাদ্যদ্রব্য-সংরক্ষণপ্রণালী ইত্যাদি শাস্ত্র সকলের উদ্ভব হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আবদ্ধ আধারে (টিনের কৌটায়) খাদ্যদ্রব্য বহুকাল সংরক্ষণ প্রণালী ও তদুদ্দেশে বহু শিল্প-ব্যবসায় প্রসার লাভ করিয়াছে। যেমন মানবদেহের রোগজনিত বিকৃতি ও আবর্জনা অপসারণের প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সেইরূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জীবাণুতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিদ্যাও প্রসার লাভ করিতেছে।

অন্যপক্ষে অল্প কয়েক প্রকার জীবাণু মানবদেহে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পশুদেহে রোগ উৎপাদন করে। পশুদেহে রোগ কম হয়, কারণ জীবাণুর সংক্রমণ নিকৃষ্ট প্রাণীরা স্বভাবতঃ প্রতিরোধ করিতে অধিক সক্ষম। শত্রু হিসাবে জীবাণুকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) ব্যক্তিগত (২) সমাজ ও জাতিগত (৩) বর্ণ এবং বংশগত (৪) সভ্যতার শত্রু।

মানবদেহের যত প্রকার ব্যাধি আছে তাহার শতকরা ৮০ ভাগের কারণ পরিজ্ঞাত। প্রায় ৫০ ভাগ জীবাণু কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৩০ ভাগ অচেতন পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণুজনিত রোগ এত ব্যাপক যে প্রত্যেক মানবই এই সকল সংক্রামক রোগের কোন না কোনটা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়শ্রেণীর জীবাণুর উপদ্রব প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময় নিকটবর্তী স্থানে, সমগ্র গ্রামে, দেশে, এমনকি সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যখন কোন সংক্রামক রোগ একটি জনপদে অনবরত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তখন ইহাকে মহামারী বলে। সাময়িক ভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ইহা ঘটিলে তাহাকে সাধারণ মহামারী (epidemic) বলে। কিন্তু যখন একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে ঐ রোগ বিস্তৃত হয় তখন তাহাকে বিশ্বধ্বংসী (pandemic) বলে। বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রায় সকল সময়েই দেখা যায়। কলেরার আক্রমণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘটে; পক্ষান্তরে, গত মহাযুদ্ধের পরে ইনফ্লুয়েঞ্জা সমস্ত পৃথিবীর উপর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীতে মহামারীর প্রকোপ বিদ্যমান আছে। প্রাচীন হিন্দুজাতি, ব্যাবিলিয়ন জাতি, মিশরীয় জাতি, হিব্রু জাতি, সকলেই মহামারীর সহিত পরিচিত ছিল এবং "অদৃশ্য দানবের কার্য", "ভূতের হাত", "ঈশ্বরের ক্রোধ" ইত্যাদি নামে সংক্রামক রোগকে সূচিত করিত।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বপ্রথম জীবাণুতত্ত্বের উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহারও তিনশত বৎসর পূর্বে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাকাষ্টোরো (Fracastoro) তাঁহার "De Contagione et Contagiosis morbis et curatione" নামক পুস্তকে স্পর্শক্রামক ও সংক্রামক তথ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। এই তথ্য বহু সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দুদিগের জানা ছিল।

সুশ্রুত (সু-নি-৫।২৬) সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে অতিস্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ যে কেবলমাত্র বিসূচিকা মহামারীর প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, অদৃশ্য অতি-সূক্ষ্ম একপ্রকার পদার্থ পঙ্কিল ও পচনপ্রাপ্ত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া বিসূচিকা মহামারী সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বিসূচিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত আধুনিক জীবাণুশাস্ত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। বিসূচিকা এবং যক্ষ্মাজীবাণু দ্বারা সমাজ এবং জাতির যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়, তাহা সকলেই বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে বিখ্যাত পানামা খালের ইতিহাস হইতে আমরা ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের জীবাণুর ধ্বংসলীলা বর্ণনা করিতেছি।

পানামা খালের ইতিহাস

পানামা যোজকের মধ্য দিয়া একটি খাল খননের পরিকল্পনা দ্য লেসেপ্স্ (De lesseps) উত্থাপন করেন। ইহাতে দক্ষিণ আমেরিকা বেষ্টনকারী আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ জলপথ ৪৫০০ মাইল কম হইয়াছে। একটি ফরাসী কোম্পানি পানামা খাল তৈয়ারি করিবার জন্য অজস্র অর্থ দ্য লেসেপ্স-এর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই খাল তৈয়ারি করিতে গিয়া বিশ হাজার লোক পীতজ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় মারা যায় এবং সহস্র সহস্র লোক অকর্মণ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। অকৃতকার্য হইয়া অংশীদারেরা সর্বস্বান্ত হয় এবং দ্য লেসেপ্স্ অসম্মানিত হইয়া বন্দী অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। সেই সময়ে পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ-প্রণালী অজ্ঞাত ছিল। মশকই যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত করে তাহা এই সময়ে আবিষ্কৃত হইল। এবং পরে ইহাও

দেখা গিয়াছে যে ম্যালেরিয়ার মত পীতজ্বর কেবলমাত্র মশক-দংশনেই সুস্থ শরীরে সংক্রামিত হয়।

একটি নূতন কোম্পানি আমেরিকার অর্থে পানামা খালনির্মাণের অসম্পূর্ণ কার্যে ব্রতী হইল। ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের সংক্রমণ সম্বন্ধে জ্ঞানই তাহাদের প্রথম পাথেয় রূপে ব্যবহৃত হইল। প্রথম তাহারা খালখনন কার্যে উদ্যোগী না হইয়া মশক প্রতিষেধক প্রণালী প্রবর্তন করিল। ১৮ মাসের মধ্যে মশক-নিবারণী প্রতিষ্ঠান জয়যুক্ত হইল। যে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের আক্রমণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ঐ প্রদেশের জনপদ উচ্ছিন্ন হইত তাহা চিরতরে রুদ্ধ হইল। আজ এই পানামা খাল বর্তমান যুগের একটি বিরাট শিল্পকীর্তি।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সহিত প্রত্যেকেই পরিচিত। অধুনা ইহা প্রায় বর্ষে বর্ষে প্রতি শীতকালে বিভিন্ন তীব্রতায় আবির্ভূত হয়। সাধারণতঃ উপলব্ধি হয় না যে বিসূচিকা, আন্ত্রিকজ্বর (টাইফয়েড), গ্রন্থিকজ্বর (প্লেগ) এবং অন্যান্য ভীষণ মহামারী অপেক্ষা অধিক লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি স্বভাবতঃই ক্ষীণ, এজন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা সাধারণতঃ কয়েক বৎসর পর্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া পুনরায় প্রবল প্রকোপে আবির্ভূত হইলে জনসাধারণ, এমন কি চিকিৎসকগণও, ইহাকে "নূতন ব্যাধি" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ভীষণ পৃথিবীব্যাপী মহামারী আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তিন-চার বৎসরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক, অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বসমেত যত লোক নিহত হয় প্রায় তাহার তিনগুণ লোক এই ভীষণ

মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একমাত্র ভারতবর্ষেই পাঁচ লক্ষেরও অধিক লোকের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই তিনবৎসরে ভারতে প্রতি ৭০ জনে একজন এবং পৃথিবীতে প্রতি একশত জনে একজন করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায়।

যদিও গ্রীক-চিকিৎসক হিপক্রাটিস্-এর (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০) সময় হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্ঞাত ছিল তথাপি একজন ইটালীবাসী ইহাকে "ex influentia Coalesti" অর্থাৎ "গ্রহের প্রভাব" নামে অভিহিত করেন এবং উত্তরকালে ইহাও "influenza di freddo" অর্থাৎ "ঠাণ্ডার প্রভাব" নামে সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিচিত হয়। সেই সময় হইতেই ইনফ্লুয়েঞ্জা নাম চলিয়া আসিতেছে। প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর অন্তর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর অল্পাধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু মানবদেহে অন্যান্য রোগ উৎপাদক জীবাণু অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যেও ইহার আকৃতি দেখা যায় না। সেইজন্য ইহাকে অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাণু (virus) বলা হয়। সাধারণ সর্দি (ইহা একটি দুর্বোধ্য ও সুদূরপ্রসারী রোগ), বসন্ত, পানিবসন্ত, হাম, গণ্ডস্ফীতি রোগ (mumps), তরুণ ও শৈশবীয় পক্ষাঘাত (acute anterior poliomyelitis), জলাতঙ্ক (rabies), পীতজ্বর ইত্যাদি রোগসমূহের উৎপাদক জীবাণুগুলিও সমশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ virus জাতীয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে রোগীর শ্বাসনালী ও শ্লেষ্মায় ফাইফার (Pfeiffer) বহুল পরিমাণে জীবাণু লক্ষ্য করেন। সুতরাং এই জীবাণুই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ উৎপাদনের হেতু স্থিরীকৃত হয়। এবং পরবর্তী মহামারীতে যখন এই সকল জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গেল না তখন সেই সকল রোগ ইনফ্লুয়েঞ্জা নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯১৮

খৃষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে ফাইফার জীবাণুর চিহ্ন আদৌ ছিল না। আধুনিক যুগে ইহাই স্থির হইয়াছে যে এই রোগ ফাইফার জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয় না, অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাণু (virus) দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে নিউমোনিয়া-জনিত উপসর্গই প্রধানতঃ এই রোগের মৃত্যুহার বর্ধিত করে। নিউমোকক্কাস বা স্টেপ্টোকক্কাস কোন কোন ক্ষেত্রে ফাইফার জীবাণু বা অন্যান্য জীবাণু এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে রোগীর ফুসফুস আক্রমণ করে। সাধারণতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা-জীবাণু দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হয় না। কিন্তু উহারা রোগীর জীবনীশক্তিকে এত হ্রাস করে যে অন্যান্য জীবাণুর পক্ষে আক্রমণের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে, ফলে রোগীর মৃত্যু হয়।

জীবাণুর ধ্বংসলীলায় বহু জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদ দুইজন ধর্মযাজকের জন্মভূমি পবিত্র জেরুজালেম ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশ সকলের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে স্বয়ং যীশুখৃষ্টের সময় হইতে জেরুজালেমে যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতি স্ব স্ব রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে। গত যুদ্ধে ইংরেজ ট্রন্সজর্ডনিয়া এবং ফরাসী সিরিয়া অধিকার করে। বর্তমান যুদ্ধেও এই স্থানের গুরুত্ব বিশ্বের নিকট অনাদৃত নহে। বাইবেলে আছে যে আসেরিয়ার (Assyria) রাজা সেনাচেরিব (Sennacheribe) জুডারাজ্যে প্রবেশ করিয়া নগরী অবরোধ করিলে জুডার রাজা হেজেকিয়া (Hezakiah) এবং ধর্মগুরু ঈষাইয়া (Isaiah) ঈশ্বরের নিকট সকরুণ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। ঈশ্বর একজন দেবদূত প্রেরণ করেন, ফলে রাজা সেনাচেরিবের শৌর্যশালী সৈন্য সামন্ত নষ্ট হইয়া যায়, এবং হেজেকিয়া ও জেরুজালেমের অধিবাসিগণ রক্ষা পায়।

বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা, বিপদজনক (malignant) ম্যালেরিয়া রোগে সেনাচেরিবের লোকজন বিনষ্ট হইয়াছিল। জর্ডন উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বহু নিম্নে অবস্থিত। সৈন্যগণ যখন উত্তপ্ত উপত্যকা হইতে শীতল জেরুজালেমে উপনীত হয় তখন হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে সহস্র সহস্র লোক হিমাঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ম্যালেরিয়ার জীবাণুই ভগবানের প্রেরিত দেবদূত, যিনি জেরুজালেম-বাসিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানের ১৯০০ বৎসর পরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধে তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় ইংরেজ সৈন্যগণ সেই একই উত্তপ্ত জর্ডন উপত্যকা অধিকার করিতে অগ্রসর হয় এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। বায়ু পরিবর্তনের জন্য সৈন্যদিগকে অবিলম্বে উচ্চ শীতল স্থান জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করা হয়। (দেবদূত ঐস্থানে এইসকল ইংরেজ সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন!) ফলে তাহাদের আগমনের রাত্রিতেই অর্দ্ধেক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যস্থানে গ্যালিপোলিতে কুড়ি হাজার ইংরেজ সৈন্য প্রবাহিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে বিজয়লক্ষ্মী তুরস্কের গলায় জয়মাল্য অর্পণ করেন।

যখন নেপোলিয়ান প্যালেস্টাইন্ আক্রমণ করেন, তখনও "দেবদূত" (ম্যালেরিয়া-জীবাণু) নেপোলিয়নের সৈন্যগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। এই জাতীয় ঘটনা ইতিহাসে আদৌ বিরল নহে।

বর্ণ এবং বংশগত শত্রু

জীবাণুর প্রভাবে ব্যক্তি এবং জাতি যেরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় সেইরূপ এক-একটি বংশেরও সর্বনাশ সাধিত হয়। কেবল মানব কেন, পশুবংশেরও উচ্ছেদ হয়। ডাইনোসরাস্ নামক প্রাগৈতিহাসিক

যুগের বিরাট সরীসৃপের বংশ প্রায় দশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুক হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই বিলোপ এত সত্বর সংঘটিত হয় যে মহামারীই ইহার সম্ভাব্য কারণ গণ্য করা হয়। এই ধারণা বহু বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

ভারতের স্থাপত্যশিল্পের গৌরবময় নিদর্শন প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে হাজার বৎসর পূর্বে সে স্থানে বিরাট সৌধমালা বিরাজ করিত। তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং আবার কয়েক বৎসর পরে তৎকালীন রাজত্বে পুনরায় সেই স্থানেই নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে কয়েকবার সেইস্থান একবার পরিত্যক্ত হয় এবং পুনরায় সেই স্থানেই নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইহার কারণ কি? অগ্নিকাণ্ড অথবা ভূমিকম্পের ফলে কি এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল? অথবা মহামারী (প্লেগ?) এই স্থানকে বার বার উৎসন্ন করিয়াছিল? পুরীর নিকটবর্তী কণারকের সমৃদ্ধিশালী সূর্য মন্দিরে দেবতার মূর্তিপ্রতিষ্ঠার পূর্বেই উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অপরূপ সৌন্দর্যের আধার ইলোরা এবং অজন্তাগুহাও পরিত্যক্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনার কারণ কি?

ভারতবর্ষের বাহিরে ইন্দোচীনের সমৃদ্ধিশালী আংকোরভাট (Angkorvat) মন্দিরের এবং জাভার বরবডুর পিরামিডের জনশূন্যতার কারণ ম্যালেরিয়া বা কলেরা বলিয়া অনুমিত হয়। আফ্রিকার অন্তর্গত মাশোনাল্যাণ্ড (Mashonaland) অঞ্চলের শহরগুলির ধ্বংসের কারণ নিদ্রারোগ (sleeping sickness), ইউকাটান (Yucatan)-এর অন্তর্গত মায়া শহরগুলির উচ্ছেদের কারণ পীতজ্বর বলিয়া অনুমান করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সভ্যতার ধ্বংসসাধন করিতে এত শক্তিশালী?

অদৃশ্য শত্রুর রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি

জীবাণুগুলি দক্ষ সমরবিৎ। ইহারা সুযোগ অপেক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে এবং কোনও অবস্থায় মানুষ উহাদের কবলে সহজে পতিত হইলেই আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। মানবের বর্তমান যুগের জীবনযাত্রা জীবাণুর পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ আনয়ন করিয়াছে। মানুষ যতই সভ্য হইতেছে ততই গ্রাম হইতে নগরাভিমুখী হইতেছে। ঘন সন্নিবেশিত গৃহাদি, প্রতিগৃহে বহু সংখ্যক অধিবাসীর বসবাস, চিত্রগৃহে নিত্যনৈমিত্তিক বহুল জনসমাগম প্রভৃতি মানব দেহে জীবাণু প্রবেশের পথ সুগম করে। যখন মানুষ আধুনিক জীবন প্রণালীর আনুষঙ্গিক দুঃখ কষ্ট অবসাদিতে ম্রিয়মাণ হয় তখন জীবাণু মানবের শ্রান্তিক্লান্তি-জনিত প্রতিরোধশক্তিহীনতার সুযোগ গ্রহণ করে। নাগরিক জীবনে মানবের শ্রমবিমুখতার ফলে শারীরিক প্রতিরোধশক্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সভ্যজীবনে বিশেষভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাদ্যে আসক্তি জন্মে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের অতি-ভোজন। কেবল দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে অনশনজনিত মৃত্যু দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে যে পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি জন্মে তাহা জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কার্য করে। সভ্যমানবের নিয়ত চেষ্টা ও তাহার জনস্বাস্থ্যবিভাগ জীবাণুসংক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য শ্রমের ত্রুটি করে না, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বর্তমানে জীবাণুই অনুকূল অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

মনুষ্যদেহের বাহিরে উদ্ভিদ্‌জাত জীবাণু (bacteria) কোন প্রকার আকৃতির পরিবর্তন না করিয়া এক হইতে অন্যদেহে গমনাগমন করিতে পারে। প্রাণীজাত জীবাণুর (protozoa) অবস্থা বিভিন্ন। ম্যালেরিয়া

জীবাণু কিংবা কোন অ্যামিবা রোগীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় আশ্রয়দাতার দেহে সংক্রামিত হইবার পূর্বে মনুষ্য-দেহের বাহিরে থাকিয়া একটি জীবন-চক্রের মধ্য দিয়া যায়। প্রবাহিকা রোগাক্রান্ত রোগী মলের সহিত বহুসংখ্যক গতিশীল ও বর্ধনশীল অ্যামিবা ত্যাগ করে। যদি এই অবস্থায় এই সকল জীবাণু দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয় তাহা হইলে সে জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয় না, উহারা সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি অ্যামিবার সিস্ট (cyst) মলের সহিত নির্গত হয়, তাহা দূষিত খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির অন্ত্রে প্রবেশ করিলে সংক্রমণ আরম্ভ হয়। মনুষ্যদেহ সংক্রামিত করিবার পূর্বে ম্যালেরিয়া জীবাণু মশকীদেহে একটি নির্দিষ্ট জীবন-চক্র অতিবাহিত করে। একটি মশকী কোন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পান করিবার অব্যবহিত পরে অন্য লোককে দংশন করিলে সংক্রামকতা জন্মে না, দুই সপ্তাহ পরে মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন-চক্র সম্পূর্ণ হইলে তখনই জীবাণু সংক্রামক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ক্রিমির আচরণও একই প্রকার। ক্রিমি চক্ষুতেই দৃষ্টিগোচর কিন্তু সংক্রমণ অবস্থায় তাহারা অতি ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য। প্রায় প্রত্যেক ক্রিমিরই এক বা একাধিক মধ্যবর্তী আশ্রয়দাতার আবশ্যক হয় এবং পরবর্তী মনুষ্যদেহকে সংক্রামিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র অতিক্রম করিতে হয়। এ সম্পর্কে জঙ্গম জীবাণুর (প্রোটোজোয়া বা ক্রিমির) সহিত স্থাবর জীবাণুর (bacteria) পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্থাবর জীবাণুর কোন মধ্যবর্তী আশ্রয়দাতার আবশ্যক হয় না। কোন কোন রোগে যেমন অ্যানথ্রাকস্, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতিতে জীবাণুগুলি মনুষ্য দেহের বাহিরে বহু সময় পর্যন্ত অবস্থান করে এবং সূক্ষ্ম বীজাকারে একটি আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক অবয়ব নির্মাণ করে। যখন

সুযোগ উপস্থিত হয় তখন বীজগুলি নূতন আশ্রয়দাতার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সংক্রামিত করে।

শত্রুর বর্ম চর্ম

অধিকাংশ জীবাণুরই আত্মরক্ষার জন্য কোন বিশেষ বর্মাদির আবশ্যক হয় না। কিন্তু কয়েকপ্রকার জীবাণু, যেমন নিউমোকক্কাস এক প্রকার বর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই বর্মের আকৃতি একটি বীজকোষের ন্যায়। একজোড়া জীবাণুর চতুষ্পার্শ্বে এই বীজকোষ অবস্থিত। বীজকোষটি যথেষ্ট স্থূল ও আঠাবৎ। জীবাণু নিঃসৃত রস হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। মানব ও পশুর প্রবল শত্রু যক্ষ্মাজীবাণুও বর্মাদিতে সজ্জিত থাকে। এই আবরণ মেদবৎ এবং জীবাণুর সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখে, ফলে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রবল বাধা দিবার শক্তি জন্মে। অপর এক জাতীয় জীবাণু দেখা যায় উহারা নিজেদের শরীরাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম রেণু (Spore) নির্মাণ করিয়া দুর্দিনের জন্য জীবনপ্রদ আবশ্যকীয় খাদ্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া রাখে। যখন জীবাণু প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয় কিম্বা যখন পুষ্টিকর পদার্থ সংগ্রহের অপ্রতুলতা জন্মে তখন রেণুগুলির উদ্ভব হয়। এই রেণুগুলি বহিঃশত্রুর প্রবল প্রতিরোধক, এবং রেণু যত পুরাতন হয় ততই ইহার প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রেণুবিহীন জীবাণু কর্মঠ ও বর্ধিত অবস্থায় থাকিলেও উহাকে সহজেই অর্ধঘণ্টার মধ্যে ৫৫ ডিগ্রি উত্তাপ প্রয়োগে কিম্বা মৃদু পচন-নিবারক (antiseptic) ঔষধ দ্বারা নষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু রেণুগুলিকে নষ্ট করিতে হইলে কয়েক ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়, কিম্বা প্রবল পচন-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। যে সমস্ত জীবাণু ধনুষ্টঙ্কার, gas-gangrene, anthrax প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে তাহারা রেণু-উৎপাদক জীবাণুশ্রেণীর অন্তর্গত।

অদৃশ্য শত্রুর প্রবেশ পথ

মানবদেহে বিভিন্ন জীবাণুর বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রবেশপথ আছে। অনেক জীবাণুই যে-কোন পথ দিয়া মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু অধিকাংশ জীবাণু কোনও নির্দিষ্ট তন্তু বা শারীর যন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে তবেই সংক্রামক হয়। বিসূচিকা, প্রবাহিকা এবং টাইফয়েড্ জীবাণু-গুলি সংক্রামিত হইতে হইলে খাদ্য বা পানীয় দ্বারা মহাস্রোতপথে শরীরে প্রবেশ করে। এই জীবাণুগুলি কেবলমাত্র সুস্থ চর্মের সংস্পর্শে আসিলে এমনকি ঘৃষ্টচর্মের সংস্পর্শে আসিলেও কোন সংক্রমণ উৎপাদন করে না। ম্যালেরিয়া-সংক্রমণ উৎপাদনের জন্য মশকীর আবশ্যক হয়। মশকী জীবাণু-গুলিকে প্রবহমান রক্তস্রোতে নিক্ষেপ করিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে।

যখন জীবাণুগুলি নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া আশ্রয়দাতার রক্ষাব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হয়, কেবল তখনই সংক্রমণ সফল হয়। সাধারণতঃ পুঁজ উৎপাদনকারী জীবাণু চর্মের মধ্য দিয়া, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মা জীবাণু শ্বাসনালীপথে, টাইফয়েড কলেরা ও প্রবাহিকা জীবাণুগুলি অন্ননালীপথে এবং গণোরিয়া জীবাণু মূত্রনালী, জননেন্দ্রিয় ও নেত্রবর্ত্ম মধ্য দিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এই সকল জীবাণুর মধ্যে অনেকগুলি উপরোক্ত পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। সংক্রামক জীবাণুর প্রধান পথগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল, যথা—

১। চর্মপথে—স্বাভাবিক অবস্থায় চর্ম জীবাণু-সংক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু চর্ম দেহের বহির্দেশে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া সহজেই আহত হইতে পারে। এই সকল পরিদৃশ্যমান ক্ষত, এমন কি ঘৃষ্টচর্মের অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য ছিদ্রও জীবাণু প্রবেশের পথ। চর্মের কোন বিকৃত অবস্থা না থাকিলেও জীবাণু সকল স্বেদগ্রন্থি সকলের

ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। অক্ষত চর্মের উপরে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু ঘর্ষণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্ফোটক (furuncle) উৎপাদন করিতে পারা যায়। অনেক জান্তব জীবাণু যেমন ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি মশক-দংশন বা অন্যান্য বাহক দ্বারা চর্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

২। মহাস্রোত পথে—যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় মহাস্রোত জীবাণুতে পূর্ণ থাকে তথাপি অনেক জীবাণু ঐ পথে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। মুখমধ্যস্থ টনসিল প্রায়ই যক্ষ্মা, স্ট্যাফাইলো প্রভৃতি জীবাণুর এবং গলনাসিকা মেনিঙ্গোকক্কাস, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি জীবাণুর প্রাথমিক আক্রমণের পথ। যদিও পাকস্থলী জীবাণু-সংক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয় তথাপি অম্লনিঃসরণের জন্য কতকটা রক্ষিত থাকে।

৩। শ্বাসনালী পথে— কয়েকটি জীবাণু প্রশ্বাসের সহিত শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিয়া ফুসফুস আক্রমণ করে। যেমন নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি।

৪। মূত্র-জননেন্দ্রিয় পথে—গণোরিয়া, ফিরঙ্গরোগ প্রভৃতি সংক্রামক জননেন্দ্রিয়-রোগের জীবাণু মূত্র ও জননেন্দ্রিয় পথে প্রবেশ করে।

৫। রক্ত স্রোতে—অনেক জীবাণু বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় রোগ-জীবাণু যেমন ম্যালেরিয়া, প্লেগ, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি কীট-পতঙ্গাদির দংশন দ্বারা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে।

অদৃশ্য শত্রুর সংখ্যা ও তীব্রতা

যে সকল জীবাণু ক্ষতিসাধন করে তাহারা সংখ্যায় এবং তীব্রতায় যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক। দেখা গিয়াছে যখন জীবাণুগুলি তীব্রতাবিহীন হয় তখন অসংখ্য জীবাণুর উপস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের দেহরক্ষাকারী প্রতিষেধকগুলি দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন

করিতে সমর্থ হয়, পরন্তু যদি মুষ্টিমেয় জীবাণুও তীব্র বিষসম্পন্ন হয় তাহা হইলে উহারা দেহরক্ষাকারী প্রতিবন্ধক অনায়াসেই ছিন্ন করিতে পারে। গিনিপিগের শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটি মাত্র জীবাণুও যদি তীব্র শক্তিসম্পন্ন হয় তাহা হইলে সংক্রমণ জন্মাইতে সক্ষম হয় এবং পরিণামে গিনিপিগের মৃত্যু ঘটায়। Anthrax জীবাণুও অনুরূপ কার্য করে।

রোগগ্রহণক্ষম প্রাণীর দেহে জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার তীব্রতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, আবার কৃত্রিম অভিবর্ধনকারী (Culture Media) খাদ্যে উহা পুনঃ পুনঃ আবাদ (culture) করিয়া উহার তীব্রতা প্রভূত পরিমাণে হ্রাসও করিতে পারা যায়। এই তথ্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা সহজেই স্থির করা যায়। নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীর শ্লেষ্মা হইতে Pneumococcus জীবাণু বিশুদ্ধভাবে আবাদ করিয়া পৃথক্ করিতে হয়। পরীক্ষার নিমিত্ত এই আবাদ দুইভাগে ভাগ করিয়া প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আবাদ হইতে দশদিন পর্যন্ত প্রতিদিন ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ আবাদ করিতে হয়। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত আবাদ হইতে কতক জীবাণু একটি ইন্দুরের দেহে সূচীপথে প্রবেশ করান হয়; পরদিবস প্রথম ইন্দুরের হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত লইয়া তাহা দ্বিতীয় ইন্দুরের গাত্রে প্রবেশ করাইতে হয়। এইরূপে তৃতীয় বা ততোধিক ইন্দুরের শরীরে প্রবেশ করান হয়। এইভাবে, একটি কৃত্রিম উপায়ে আবাদ করিয়া এবং অপরটি জীবন্ত ইন্দুরের দেহস্থ রক্তমধ্যে আবাদ করিয়া দুইটি আবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই দুইটি আবাদের জীবাণুর তীব্রতার পার্থক্য বিস্ময়কর। কৃত্রিম আবাদ হইতে প্রচুর পরিমাণ জীবাণু (যেমন ১ সিসির ১০ ভাগের এক ভাগ জীবাণু) একটি ইন্দুরের শরীরে প্রবেশ করাইলে ইন্দুরটি মরিতে পারে নাও

মরিতে পারে। পক্ষান্তরে ইন্দুরের দেহ হইতে যে আবাদ প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার ১ সিসির লক্ষ ভাগের একভাগ অথবা তদপেক্ষাও কম পরিমাণ কোন ইন্দুরের শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে ইন্দুরটি মরিয়া যাইবে। ইহাতেই দেখা যায় যে জীবদেহের মধ্যে যখন কোনও জীবাণু রোগ জন্মায় তখন দেহস্থ সেই জীবাণু অতি তীব্র বিষ উৎপন্ন করে।

স্বভাবতঃ রোগোৎপাদক জীবাণুসকল উপযুক্ত পথে, উপযুক্ত সংখ্যায় এবং উপযুক্ত তীব্র অবস্থায় দেহে প্রবেশ করিয়া সংক্রমণ উৎপাদন করে। কিন্তু জীবাণুর সংখ্যা এবং তীব্রতা যাহাই থাকুক না কেন দেহে রোগ উৎপাদন করিয়া ক্ষতি করিবার পক্ষে কেবল তাহাই পর্যাপ্ত নহে। কোন ক্ষতি করিতে হইলে উহাদিগকে দেহাভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যায় বর্ধিত হইতে হয় এবং যদি আমাদের দেহ উপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধির উপকরণ যোগায় তবেই উহাদের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়। বংশবৃদ্ধির প্রধান উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে জীবাণুর খাদ্য ও উত্তাপ, যাহা দেহের পুষ্টিকর পদার্থের মধ্যে সর্বদাই নিহিত আছে। বহুক্ষেত্রেই জীবাণুর পক্ষে পুষ্টিকর উপাদান মানবের অপকৃষ্ট (necrosed) তন্তু হইতে উৎপন্ন হয়। ঘর্ষণ অথবা অন্যান্য আঘাত পচনশীল তন্তু উৎপাদন করে।

Staphylococcus প্রভৃতি জীবাণু উপযুক্ত আবেষ্টনীতে অতিদ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রতি ২০ মিনিটে একটি জীবাণু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি জীবাণুতে পরিণত হয়। এই হিসাবে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি বংশবৃদ্ধির সময় অন্য শত্রু কর্তৃক জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টায় একটি জীবাণু হইতে লক্ষ লক্ষ জীবাণু উৎপন্ন হয়।

শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র

জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন বিষই তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র, এবং তন্তুর অনিষ্ট ও অপচয়ের জন্য জীবাণুর উৎপাদিত বিষই বিশেষভাবে দায়ী। শরীরের যে স্থানে জীবাণু দ্বারা বিষ উৎপন্ন হয় সেই স্থানের জীবকোষ অথবা বিষ শোষিত হইয়া দেহের দূরবর্তী অংশে নীত হইবার পরে শরীরস্থ জীবকোষের ক্ষতি সাধিত হয়। অনেক সময় তন্তু সম্বন্ধে বিষের এক প্রকার অদ্ভুত মনোনয়ন দেখা যায়। Staphylococcus জীবাণুর বিষ শ্বেত রক্তকণিকার উপরে অর্থাৎ আমাদিগের শরীররক্ষাকারী সৈন্যদিগের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করিয়া উহাদের ধ্বংসসাধন করে। পক্ষান্তরে ধনুষ্টঙ্কার বিষ উৎপত্তি স্থলের বহু দূরবর্তী অংশের নার্ভ (Nerve) মণ্ডলীকে আক্রান্ত করে। বিষের এই নির্বাচন ক্রিয়া অন্যান্য বিভিন্ন জীবাণুতেও দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রবাহিকা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি জীবাণু উল্লেখযোগ্য। কোন কোন Streptococcus জাতীয় জীবাণু লোহিত রক্তকণিকার উপরে কার্য করিয়া উহাদের ধ্বংসসাধন করে; সেইজন্য উহারা Streptococcus heamolyticus নামে পরিচিত।

বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন বিষ জীবাণুর দেহ হইতে, যেমন ধনুষ্টঙ্কার ডিপথেরিয়া প্রভৃতি, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মুক্ত করা যায়। ইহাদিগকে বহির্বিষ (Exotoxin) বলে। জীবাণুগুলিকে আবাদ যন্ত্রে (Culture media) উৎপন্ন করিয়া পরে পরিশ্রুত করিয়া সেই বহির্বিষ পৃথকভাবে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অন্য জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন বিষকে অন্তর্বিষ (Endotoxin) বলে। ইহারা জীবাণুর দেহাভ্যন্তরে বীজকোষে বেষ্টিত অবস্থায় থাকে সুতরাং জীবাণু হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। কেবলমাত্র জীবাণুদেহ পেষণ করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারা যায়।

অনেক জীবাণু-বিষের তীব্রতা অপরিমিত। উদাহরণস্বরূপ ধনুষ্টঙ্কার রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু-বিষের তীব্রতা সমপরিমাণ কেউটে সাপের শুষ্ক বিষের প্রায় বিশগুণ বেশী। কেবলমাত্র ১৮ ফোঁটা (1 c.c.) ধনুষ্টঙ্কার বিষে ৭৫০০০ গিনিপিগের মৃত্যু ঘটান যাইতে পারে।

শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয়

রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুসকল রোগ উৎপাদন ব্যতীত পচন (putrefaction), গাঁজন (fermentation) প্রভৃতি জন্মাইতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল কারণ বশতঃ রোগীর দেহতন্তুর বিকৃত অবস্থা উৎপন্ন হয়। জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য (metabolic products) প্রধানতঃ (ক) রোগোৎপাদক বিষ, (খ) পচন ও গাঁজন উৎপাদক enzyme, এবং (গ) অন্যান্য বর্ণোৎপাদক (chromogenic) পদার্থ প্রভৃতি। ইহারা নিম্নে বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত।

অন্তর্বিষ (Endotoxin)—এই সকল বিষ জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন হয় এবং কোষের অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে। যে পর্যন্ত ইহারা বিশ্লিষ্ট না হয় সে পর্যন্ত অন্তর্বিষ নিঃসৃত হয় না, সুতরাং যদি জীবাণুগুলিকে তরল পদার্থের মধ্যে আবাদ করিয়া পরিস্রুত করা হয় তাহা হইলে সেই তরল পদার্থের মধ্যে সামান্য অথবা আদৌ কোন বিষ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ সাধারণ রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু অন্তর্বিষ উৎপাদন করে।

বহির্বিষ (Exotoxin)—জীবাণুর বংশবৃদ্ধির সময় এই সকল বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং উহা জীবাণুদেহের বাহিরে নিঃসৃত হয়। এই বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া এত প্রবল যে বিষের ওজনের লক্ষগুণ ওজনের একটি জন্তুকে মারিয়া ফেলিতে পারে। তবে ৬০ ডিগ্রি উত্তাপে ইহা নষ্ট হয়।

লাল-রক্তকণিকাধ্বংসকারী পদার্থ (Haemolysins)—এই সকল পদার্থ লোহিত রক্তকণিকার ধ্বংসসাধন করে, যথা—haemolytic streptococcus বিষ।

শ্বেত-রক্তকণিকাধ্বংসকারী পদার্থ (Leukocidin)—এই সকল পদার্থ শ্বেত রক্তকণিকাকে নষ্ট করে, যথা—Staphylococcus বিষ।

আক্রমণ প্রণালী

জীবাণুগুলির প্রবেশপথ এবং রোগোৎপাদন যেরূপ বিভিন্ন সেইরূপ তাহাদের আক্রমণ প্রণালীও বিভিন্ন দেখা যায়। জীবাণুর সংখ্যা-বৃদ্ধির ক্ষমতা, আক্রমণ-শক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন তন্তুতে বিস্তৃতি ও তন্তুর উপরে বিষক্রিয়ার প্রভাব অনুসারে জীবাণুগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) যে সকল জীবাণু আক্রমণ-ক্ষমতাহীন ও বিষবর্জিত, যেমন চর্মের নির্দোষ জীবাণু প্রভৃতি ; ইহারা কোনও রোগ উৎপন্ন করে না। (২) যে সকল জীবাণু আক্রমণ-ক্ষমতাহীন, যেমন বিসূচিকা (ইহারা অন্ত্র মধ্যেই আবদ্ধ থাকে), ধনুষ্টঙ্কার জীবাণু (ইহারা চর্মমধ্যেই আবদ্ধ থাকে), অথচ তীব্র বিষ সম্পন্ন। (৩) যে সকল জীবাণু প্রবল আক্রমণ-ক্ষমতাশালী, অর্থাৎ অতি শীঘ্র সমগ্র তন্তুতে বিস্তৃত হয়, কিন্তু নির্বিষ, যেমন anthrax জীবাণু। (৪) যে সকল জীবাণু একাধারে প্রবল আক্রমণ-ক্ষমতাশীল এবং তীব্র বিষসম্পন্ন, যেমন Streptococcus জীবাণু। নিম্নে ইহাদিগকে বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) অধিকাংশ জীবাণুই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহাস্রোতপথ (আমাদের দেহের পয়ঃপ্রণালী), উন্মুক্ত চর্ম, বায়ুগ্রহণকারী শ্বাসনালী সকলই সাধারণতঃ জীবাণুতে পূর্ণ থাকে, কিন্তু জীবাণুগুলির মধ্যে অপরাধীর

সংখ্যা অতি অল্প। উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনাক্রমণকারী ও নির্বিষ।

(২) চর্মঘর্ষণজনিত ক্ষুদ্র ক্ষত অথবা নবজাত শিশুর নাভিরজ্জুকর্তন-জনিত ক্ষুদ্র ক্ষত সাধারণতঃ আরোগ্য হয় বটে কিন্তু যদি ঐ ক্ষতমধ্যে ধনুষ্টঙ্কার জীবাণু বা তাহার রেণু (Spore) প্রবেশ করে তাহা হইলে প্রায় ১২দিন পরে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া সাংঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে। ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু ক্ষতস্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে, কখনও তন্তুতে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ করে না, কিন্তু সেই সময়ে এমন তীব্র বিষ উৎপন্ন করে যে তাহা মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ডিপথেরিয়া জীবাণু কেবলমাত্র স্থানীয় টনসিলে অথবা গলমধ্যে সংখ্যায় বর্ধিত হয়, কখনও গভীরতর তন্তু আক্রমণ করে না, কিম্বা রক্তস্রোতে প্রবেশ করে না, কিন্তু সংক্রমণস্থানে তীব্র বিষ নিঃসৃত করে। ঐ বিষ দেহে শোষিত হইয়া বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ড ও নার্ভ (Nerve) মণ্ডলীর উপর কার্য করে এবং উহার ফলে কোষসকল হয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় কিম্বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিসূচিকা রোগে জীবাণু সর্বদা অন্ত্রনলে অবস্থান করে। কখনও অন্ত্রগাত্র কিম্বা অন্য তন্তু এবং রক্তে প্রবেশ করে না, কিন্তু বিষের প্রভাবে গভীর ও অতি তীব্র লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়।

(৩) Anthrax জীবাণু এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে ইহা কোন প্রকার বিশিষ্ট বিষ উৎপাদন করে না। তন্তুমধ্যস্থ উপাদান শোষিত হইবার ফলে বিষক্রিয়ার উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ ইহা চর্ম দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অতি সত্বর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিকটবর্তী তন্তুকোষকে ধ্বংস করে, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত তন্তুমধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীপথ সৃষ্টি হয় তাহার মধ্য দিয়া

তন্তুকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। এই আক্রমণকৌশল এমনভাবে কার্যকরী হয় যে তাহার ফলে দুইটি কোষের সন্ধিস্থল জীবাণুতে পূর্ণ হয়। এইরূপে সমস্ত তন্তু আক্রান্ত হয়। এমনকি কতকগুলি রক্তবহনালী আক্রান্ত করিয়া জীবাণু রক্তস্রোতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলেও পুনরায় উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং উহাদের সংখ্যাধিক্য বলে উহারা প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির কার্যে বাধা দেয়। শত্রুর প্রবল সংখ্যাধিক্য হেতু নিছক আক্রমণ দ্বারাই এইরূপ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

(৪) Streptococcus জীবাণু এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে স্থান দিয়া এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে সেই স্থানকে আক্রান্ত করে। বেশির ভাগই জীবাণু চর্ম দিয়া প্রবেশ করিয়া স্ফোটকাদি উৎপন্ন করে। বিসর্প রোগে জীবাণু গভীর স্তরের তন্তুকে আক্রান্ত করিয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে এবং তন্তুকে পচাইয়া অথবা পুঁজ জমাইয়া (Septicaemia বা Pyaemia) সমস্ত শরীরে অসংখ্য স্ফোটক উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে নিউমোনিয়া ও টাইফায়েড জীবাণু প্রথম হইতেই সাধারণতঃ রক্তকে আক্রমণ করিয়া জীবাণুজনিত বিষাক্ততা (Bacteriaemia) উৎপাদন করে এবং পরে ফুসফুসকে আক্রমণ করিয়া নিউমোনিয়া কিম্বা অন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া আন্ত্রিক জ্বর (টাইফয়েড) উৎপাদন করে। Streptococcus জীবাণু কর্তৃক উৎপাদিত বিসর্প রোগ (erysipelas) প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। এই রোগে চর্মপ্রদাহিক সংক্রমণ বিস্তৃত হইয়া অনেক সময় সাংঘাতিক অবস্থা উৎপাদন করে। প্রসবান্তিক সংক্রমণ, চলিত কথায় যাহাকে সূতিকা জ্বর বলে, তাহাও Streptococcus জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং উহাও বিসর্প রোগের ন্যায় মারাত্মক।

আমাদের দেহস্থ শত্রুর পঞ্চম বাহিনী

স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কো "পঞ্চম বাহিনী" শব্দ প্রথম ব্যবহার করেন। দেশের অভ্যন্তরে গুপ্ত শত্রুর দল, যাহারা সৈন্যদিগের ন্যায় যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে না কিন্তু এমনভাবে কাজ করিতে থাকে যে, যে কোন মুহূর্তে দেশকে বিপ্লবের কিম্বা আক্রমণের সম্মুখে নীত করে— তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে দেহস্থ রোগজীবাণুকে বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। উহারা অনেক সময় জীবাণুবাহকের সামান্যই ক্ষতি করে কিম্বা আদৌ করে না। কিন্তু দেশকালপাত্র ভেদে যখন সময় ও সুযোগ পায় তখনই প্রবল মহামারী সৃষ্টি করে।

জীবাণুবাহক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। যাহারা জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায় তাহাদের শরীরে জীবাণুগুলি সুপ্ত বা গুপ্ত অবস্থায় থাকে। বাহকেরা সেই জীবাণু কর্তৃক সচরাচর রোগাক্রান্ত হয় না সুতরাং তাহারা জীবাণুর অস্তিত্ব আদৌ জানিতে পারে না। জীবাণুবাহক দুই শ্রেণীর আছে। এক শ্রেণীর বাহকেরা রোগাক্রান্ত হইবার পরে আরোগ্য লাভ করে কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের মলমূত্রের সহিত তীব্র বিষসম্পন্ন জীবাণু নির্গত হইতে থাকে (convalescent carriers)। অন্য শ্রেণীর বাহকেরা কখনও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় নাই কিন্তু সংক্রামক রোগী পরিচর্যার সময় কিম্বা অন্য প্রকারে কোন রোগীর সংস্পর্শে আসিবার ফলে দেহে জীবাণু আশ্রয় লয় এবং মল মূত্রের সহিত উহারা নির্গত হয় (contact carriers)। এই বাহকদের মলমূত্র হইতে জীবাণু অন্য লোকের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ সৃষ্টি করে এবং এইরূপে উহা বহুলোকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া মহামারী উৎপাদন করে। সুতরাং স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য হওয়া

উচিত যাহাতে প্রথম রোগী হইতে রোগ বিস্তৃতিলাভ করিতে না পারে। সেজন্য প্রথমে রোগীর প্রতি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, অন্যথা রোগ একবার প্রসার লাভ করিলে তাহা আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে।

কলেরা, মেনিঞ্জাইটীস, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি যে সকল সংক্রামক ব্যাধি হঠাৎ মহামারী রূপে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ দুইটি আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে ঐ রোগের জীবাণু কি অবস্থায় থাকে, সে সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন উদিত হয়। কলেরা জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাহিরে, যেমন পুষ্করিণীর জলে কলেরা-জীবাণুর জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্থায় থাকে এবং নূতনভাবে জল দূষিত না হইলে উহারা শীঘ্রই মরিয়া যায়। সুতরাং পরবর্তী মহামারী এই কারণ হইতে অর্থাৎ পূর্ববর্তী মহামারীর সময়ে দূষিত জলাশয় ইত্যাদি হইতে উদ্ভব হয় না। অধিকন্তু মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবজন্তু স্বভাবতই এই রোগ হইতে মুক্ত, সুতরাং সাধারণ অবস্থায় জীবজন্তু হইতে কলেরা বিস্তৃতি লাভ করে না। মানুষই পরবর্তী মহামারীর জীবাণুবাহক। কি প্রকারে এই সকল অন্ত্রমধ্যস্থ জীবাণু পঞ্চমবাহিনীর আচরণ করে তাহা জটিল বিষয়। সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে এই কারণে যে, বিভিন্ন মহামারীর সময় রোগের প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়; যেমন কলেরা মহামারীর প্রথম অবস্থায় অনেক সময় উহাকে উদরাময় বলিয়া ধারণা হয়, কলেরা বলিয়া সন্দেহ করা হয় না। কলেরা, প্রবাহিকা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, মেনিঞ্জাইটীস প্রভৃতি সাধারণ সংক্রামক রোগে ক্ষেত্র (মনুষ্যদেহ), বীজ (জীবাণু), সংক্রমণপ্রণালী এবং মহামারীতত্ত্ব (Epidemiology) প্রভৃতি সকলই জীবাণুভেদে পৃথক্ দেখা যায়। পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে হামের সংক্রামকতা এত তীব্র যে, সুস্থ শিশু উহার সংস্পর্শে আসামাত্রই আক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশে। এমন কি, অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন শিশুর গাত্রে হামের গুটি নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বাড়ির অন্যান্য শিশুদিগকে অন্যত্র অপসারিত করা হয় তথাপি তাহারা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে cerebro-spinal meningitis রোগে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। আক্রান্ত রোগীদিগের সংখ্যার তুলনায় এই রোগের বাহকসংখ্যাই সমধিক।

মহামারী সংক্রান্ত বাহকগণ

মহামারী সংক্রান্ত বাহকদিগকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) যে সকল মহামারী অল্পাধিক সময় অন্তর পুনঃ পুনঃ আরম্ভ হয় এবং মহামারীর প্রকোপ বিভিন্ন মহামারীতে বিভিন্নরূপ হয় অথবা একই মহামারীর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশ পায়। এই জাতীয় মহামারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের কলেরা মহামারীতে দেখা যায়। তিন প্রকারে এই রোগ সংক্রামিত হয়। (ক) প্রকৃত কলেরারোগী হইতে—এই অবস্থায় সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা খুবই থাকে বটে কিন্তু প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিবার সুযোগ থাকে সুতরাং সংক্রমণ পরিহার করা সম্ভবপর হয়। (খ) সম্পূর্ণ সাদৃশ্যবিহীন কলেরা রোগী (a typical case) হইতে—এই অবস্থায় সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশী থাকে। কারণ রোগলক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইবার ফলে কলেরা বলিয়া সন্দেহ জন্মে না, সুতরাং প্রতিষেধক উপায়ও অবলম্বন করা হয় না

এবং রোগীর সহিত অবাধে মিলামিশা হয়। (গ) জীবাণুবাহক হইতে—এই অবস্থায় জীবাণু সুস্থ শরীরে পঞ্চম বাহিনীর ন্যায় গুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং রোগ যে সংক্রামিত হইতে পারে তাহা কেহই সন্দেহ করে না, এমন কি যে সকল লোক জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায় তাহারা নিজেরাও জানে না যে তাহাদের দেহের মধ্যে জীবাণুরূপী গুপ্ত শত্রু লুকাইয়া আছে। সুতরাং অবাধ সাহচর্যের ফলে সংক্রমণপ্রবণতা প্রবল হয়। যে সকল স্থানে মহামারী পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায় সেই সকল স্থানে এইরূপ পঞ্চমবাহিনীই রোগের জন্য দায়ী।

(২) যে অবস্থায় কোন একটি সীমাবদ্ধ স্থানে মহামারীর স্বল্প প্রকোপ থাকে এবং সংক্রমণপ্রবণতাও খুব সামান্য থাকে কিন্তু জীবাণুবাহকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে, যেমন মেনিঞ্জাইটিস মহামারী। এই অবস্থায় জীবাণুবাহকদের তুলনায় রোগীর সংখ্যা খুব সামান্য, সুতরাং লোকদিগের মধ্যে সংক্রমণের বীজ গুপ্তভাবে থাকে এবং সুস্থ জীবাণুবাহকেরাই রোগবিস্তারের একমাত্র কারণ।

(৩) যখন সংক্রমণপ্রবণ ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য হয় তখন প্রবল মহামারী উপস্থিত হয়। হাম জাতীয় মহামারী উৎপাদনে জীবাণুবাহকেরা খুব সামান্য অংশ গ্রহণ করে। সাধারণতঃ হামরোগী হইতেই সংক্রমণ প্রসারলাভ করে। অধিকাংশ শিশুরাই সংক্রমণপ্রবণ এবং স্বাস্থ্যবান জীবাণুবাহকদিগের সংখ্যা অতি অল্প কিম্বা আদৌ থাকে না। হাম রোগের জীবাণুই রোগবিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট, জীবাণুবাহকদের সহায়তার আবশ্যক হয় না।

(৪) দুইটি মহামারীর মধ্যবর্তী সময়ের নিশ্চল অবস্থা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সময়ে সাধারণ লোকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা

যাইতে পারে,—(ক) রোগমুক্ত, এবং (খ) অসংক্রামিত কিন্তু সংক্রমণপ্রবণ ; ডিপথেরিয়া জীবাণু কর্তৃক সংক্রামিত রোগী এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরীক্ষা করিলে সংক্রমণমুক্ত ও সংক্রমণপ্রবণ লোককে পৃথক্ করা যায়।

এক্ষণে আমরা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিদ্যমান মহামারী রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। সকলগুলিতেই পঞ্চম বাহিনী বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

কলেরা

কলেরা রোগ থেকে আরোগ্যের পরে রোগী কেবলমাত্র একপক্ষকাল বা তদ্রূপ সময় পর্যন্ত জীবাণুবাহকের কার্য করিতে পারে। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে শতকরা প্রায় ৯০জন একপক্ষ কালের মধ্যে এবং ৯৯জন এক মাসের মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া সংক্রমণ হইতেও মুক্ত হয়। কেবলমাত্র বিরল ক্ষেত্রে ৪ মাস পর্যন্ত কলেরা জীবাণু মলের সহিত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। অন্যান্য আন্ত্রিক সংক্রমণে যেমন হয় অতি অল্প লোকই (জীবাণুবাহকেরা) রোগ-আরোগ্যের পর তীব্রশক্তিসম্পন্ন জীবাণু বহন করে কিন্তু নিজেরা পুনরায় সেইরূপে আক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিদের আপাতদৃষ্টিতে কোন রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না কিন্তু রোগীর সংস্পর্শে আসিবার ফলে রোগবিষ সংক্রামিত হইয়া তাহাদের দেহে আশ্রয়লাভ করে। সুস্থ জীবাণুবাহকেরাও রোগীর সংস্পর্শে আসিলে বা কোন কারণে পরিপাকযন্ত্রের কার্য ব্যাহত হইলে কলেরায় আক্রান্ত হইতে পারে।

জল বা খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি নূতন করিয়া দূষিত না হইলে উহাদের মধ্যে কলেরাজীবাণু অতি অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকিতে পারে। সংক্রমণের উৎস, বিশেষভাবে মহামারীর দিকে, প্রথম দৃষ্টতঃ স্বাস্থ্যবান

অথচ সংক্রামিত ব্যক্তির মল হইতে উৎপন্ন হয়। কলেরা জীবাণু সাধারণ অবস্থায় মনুষ্যশরীরের বাহিরে দীর্ঘদিন বাঁচিতে পারে না, সুতরাং জীবাণুবাহক হইতেই নিঃসন্দেহে প্রথম মহামারীর সূত্রপাত হয়। যদি জীবাণুগুলি বাহকের দেহে অবস্থান করিয়া রোগলক্ষণ প্রকাশ করে তাহা হইলে বাহক নিজেই প্রথম রোগী বলিয়া গণ্য হয়।

টাইফয়েড

কলেরার ন্যায় টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফয়েড জীবাণুগুলিও স্বাভাবিক অবস্থায় মনুষ্যদেহের বাহিরে দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং দুইটি মহামারীর মধ্যবর্তী সময়ে যে জীবাণুবাহক রোগমুক্ত ছিল মহামারীতে সর্বপ্রথম আক্রান্ত রোগী তাহার দ্বারা সংক্রামিত হয়। রবার্ট কক্ (Koch) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অন্যান্য কর্মীরা পরে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি টাইফয়েড রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে তাহাদের শরীরে টাইফয়েড জীবাণু এক বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকে। আরও জানা গিয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি টাইফয়েডে ভুগিয়াছে তাহাদের মলে ২৫ বৎসরেরও অধিককাল টাইফয়েড জীবাণু নিঃসৃত হইতে পারে। এই সকল জীবাণুবাহকদিগের মলের সহিত মধ্যে মধ্যে জীবাণু নির্গত হয়, সকল সময় হয় না; সুতরাং মল পরীক্ষা করিলে হয়ত একবার জীবাণু পাওয়া যায় কিন্তু প্রত্যেকবার পাওয়া যায় না। পিত্তকোষে এই জীবাণু অবস্থান করে। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পুরাতন বাহকদিগের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা অধিক, যাঁহারা সকল দেশে রন্ধনশালার কর্ত্রী, তাঁহাদের হস্তস্পৃষ্ট হইবার ফলে সমস্ত দেশ এবং জাতির মধ্যে রোগ বিস্তারের পথ সুগম হয়।

বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় যে সমস্ত মহামারীরই সূত্রপাত পুরাতন বাহক হইতে। সেই হিসাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে কোন্ ব্যক্তিবিশেষ যে মহামারীর সৃষ্টির জন্য দায়ী তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ইতিহাসে এইরূপ জীবাণুবাহকদের কথা পাওয়া যায়, যেমন "Typhoid Mary," "Strassburg Master Baker's wife," "Folkestone Milker" ইত্যাদি। কি ভাবে "টাইফয়েড মেরী" বহুদিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে প্রবল টাইফয়েড মহামারী সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা বোধ হয় এইস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পঞ্চমবাহিনী কি ভাবে কার্য করে এই উদাহরণেই প্রকাশ পাইবে।

যখন মেরীকে ("Mary Mallon" বা "Typhoid Mary") আবিষ্কার করা হইয়াছিল তখন তাহার বয়স ৪০ বৎসর, এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য যে ভালই ছিল তাহা তাহার পরবর্তী জীবনের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে একাকী বাস করিত, তাহার কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না, তাহার বন্দী অবস্থায় সে কখনও কোনো বন্ধুর অনুসন্ধান করে নাই, এবং যখন সে পীড়িত হইয়াছিল তখন কেহই তাহার শুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পরে যদিও মৃত্যুসংবাদ চারিদিকে প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি কেহ তাহার পরিত্যক্ত জিনিসের দাবী করে নাই।

মেরীর জীবনের কার্যাবলী অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে একটি নয়, কয়েকটি টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাবের জন্য সে দায়ী। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিউইয়র্কের অন্তর্গত Oyster Bay নামক নগরের একটি ১১জন লোকের পরিবারে মেরী রন্ধনকর্ত্রী ছিল। ৪ঠা আগষ্ট সে কাজে যোগদান করে। ২৭শে আগষ্ট প্রথম ব্যক্তি এবং ৩রা সেপ্টেম্বর শেষ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়। নূতন রাঁধুনীর আবির্ভাবের পরে

একই সময়ে সকলে সংক্রামিত হওয়ায় এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। মেরী ইতিমধ্যে চাকুরী ছাড়িয়া কোথায় যে অন্তর্ধান করে তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

মেরীর ইতিহাস, সে সাতটি গৃহস্থের পরিবারে টাইফয়েডের বীজ সংক্রামিত করিয়াছিল। প্রথম মহামারী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর Mamaronooek নগরে। দ্বিতীয় মহামারী ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর নিউইয়র্ক নগরে। তৃতীয় মহামারী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন Maine-এর অন্তর্গত Dark Harbour স্থানে ; এই মহামারীতে পরিবারের ৯জন ব্যক্তির মধ্যে ৭জন টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়াছিল : কেবল বাড়ীর কর্তা এবং পাচিকা মেরী আক্রান্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে কর্তার টাইফয়েড হইয়াছিল সুতরাং তিনি সংক্রমণপ্রবণতা হইতে মুক্ত ছিলেন ; আর মেরী তো নিজেই একজন জীবাণুবাহিকা : চতুর্থ মহামারী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ; ১লা জুন মেরী এক পরিবারে পাচিকার কার্য আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেই পরিবারে রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল ৮ই জুন। পঞ্চম মহামারী Oyster Bay নগরীতে : ষষ্ঠ মহামারী নিউইয়র্ক সহরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে : সপ্তম মহামারী Tuxedoতে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে অক্টোবর পর্যন্ত মেরী Tuxedoতে ছিল এবং তাহার আগমনের ১৪ দিন পরেই রোগ আরম্ভ হয়।

শেষে যখন তাহাকে পরীক্ষা করিতে উপস্থিত করা হইল তখন সে কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিল, তাহার মল-মূত্র পরীক্ষা করিতে দিল না। সে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিল যে তাহার কখনও টাইফয়েড হয় নাই : সে এত বাধা দিয়াছিল যে অবশেষে পুলিসের সহায়তায় অতিকষ্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া

হাসপাতালে আবদ্ধ রাখা হয়। অনন্তর জীবাণুতত্ত্বাগারে মেরীর মল পরীক্ষা করিয়া টাইফয়েড জীবাণু ধরা পড়িল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহে তিন দিন মল পরীক্ষা করা হইয়াছিল। সামান্য কয়েকবার মাত্র মলে জীবাণু পাওয়া যায় নাই, অধিকাংশ সময়েই ছিল।

মেরীর পরবর্তী জীবনের ঘটনা যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে তথাপি স্বভাবতঃ কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রেপ্তারের দুই বৎসর পরে মেরী তাহার মুক্তির জন্য উচ্চ আদালতে এই বলিয়া আবেদন করিল যে তাহাকে বেআইনীভাবে আটক রাখা হইয়াছে। জাতির বিভীষিকাস্বরূপ মেরীর মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আদালত অস্বীকার করেন। প্রায় তিন বৎসর পরে স্বাস্থ্যবিভাগ তাহাকে এই সর্তে মুক্তি দিলেন যে তাহাকে রন্ধন-ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইবে, সে অন্যের খাদ্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবে না, অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং তিন মাস অন্তর স্বাস্থ্যবিভাগে খবর প্রেরণ করিতে হইবে। তাহাকে মুক্তি দেওয়ার এক কারণ এই যে, তাহার অন্ত্র হইতে টাইফয়েড জীবাণু দূর করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল এবং তাহার পিত্তথলি অপসারিত করিতে দিতে সে সম্মতও হয় নাই। মুক্তির পরে সে সমস্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল এবং স্থানে স্থানে নাম পরিবর্তন করিয়া পুনরায় রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত হইল। এইভাবে সে নিউইয়র্কে প্রায় ৫ বৎসর কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং এই কালের মধ্যে বহু লোককে সংক্রামিত করে। ২০জন লোক টাইফয়েডে আক্রান্ত হইলে তাহাকে পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় এবং North Broter দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। এই স্থানে সে ২৩ বৎসর পর্যন্ত রাজবন্দী হিসাবে বাস করিয়াছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের সময় একদিন

প্রাতঃকালে সে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৬ বৎসর পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার শবব্যবচ্ছেদ করা হয় নাই। মৃত্যু সার্টিফিকেটে উল্লেখ আছে, মৃত ব্যক্তি ২৪ বৎসর পর্যন্ত টাইফয়েডের জীবাণু বহন করিয়া বেড়াইয়াছিল। শবানুগমন ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার মত তাহার কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না।

সেরিব্রো-স্পাইনাল মেনিঞ্জাইটীস্

সেরিব্রো-স্পাইনাল মেনিঞ্জাইটীস্ রোগে সংক্রমণপ্রবণ ব্যক্তিদিগের সংখ্যানুপাতে জীবাণুবাহকদের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে। মহামারীর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে বাহকদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। সেই জন্যই জনতা হইতে মহামারীর প্রসারলাভ সহজ হয়। বস্তুতঃ, জনতা মহামারী বিস্তারের প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য হয়। গত মহাযুদ্ধে সৈন্য বিভাগে দেখা গিয়াছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা ২।৪ জন সৈনিক জীবাণুবাহকের কার্য করে। মহামারীর ঠিক পূর্বে এই সংখ্যা বর্ধিত হইয়া শতকরা ২০।৩০ হয়। মহামারীর সময় বাহকদিগের সংখ্যা বর্ধিত হইয়া শতকরা প্রায় ৯০ হয়। সৈন্যদল সংখ্যায় যত বর্ধিত হয় বাহকসংখ্যাও তদনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা প্রায় ৭৫ জন সংস্পর্শজাত মেনিঞ্জাইটীস্ জীবাণুবাহক এক পক্ষ কালের মধ্যেই জীবাণুমুক্ত হয়, কিন্তু এক একজনের নাসিকা বা গলমধ্যে জীবাণু বসবাস করে, ফলে সেই ব্যক্তি বহু মাস এমন কি বহু বৎসর পর্যন্ত ঐ জীবাণুবাহক রূপে বিদ্যমান থাকে।

সূতিকা জ্বর

সূতিকা জ্বর উৎপাদক স্ট্রেপটোকক্কাস্ জীবাণু দুই প্রকারে রোগিণীকে সংক্রামিত করে, অভ্যন্তরাগত এবং বহিরাগত। রোগিণীর দেহের কোনো স্থান (যেমন জননেন্দ্রিয়) হইতে কিংবা নিজের সর্দি হইতে, কিংবা সম্পূর্ণ বাহির হইতে (যেমন চিকিৎসক, ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী প্রভৃতি) জীবাণু সংক্রামিত হয়। সুতরাং রোগিণীর সংখ্যা ও রোগের গুরুত্ব হিসাবে সংক্রমণের উদ্ভব বাহির কিম্বা ভিতর হইতে, তৎপ্রতি বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক। ইহারা প্রত্যেকের নাসিকা ও গলার মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করে। কোন্ জাতীয় স্ট্রেপটোকক্কাস্ হইতে সূতিকা জ্বরের উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে রোগিণীর চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীদের প্রত্যেকেরই নাসিকা এবং গলদেশ হইতে জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত রোগোৎপাদক জীবাণুর সহিত ঐ জীবাণুর সাদৃশ্য আছে কিনা।

এমিবিক প্রবাহিকা (আমাশয়)

এককোষবিশিষ্ট প্রাণী এমিবা (E. histolytica) জীবাণু মলের সহিত নির্গত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হইতে থাকে এবং সাধারণতঃ প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। প্রমাণিত হইয়াছে যে যদিও এই জীবাণু তীব্র বিষসম্পন্ন ও অন্ত্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে, এমনকি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায় তথাপি রোগীর দেহের বাহিরে অন্য লোকের কোনোই ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তির খাদ্য ঐ জীবাণু দ্বারা দূষিত হয় তখন প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে এই সকল জীবাণু রোগ সংক্রামিত করিতে পারে না। সুতরাং এমিবা জীবাণু তীব্র বিষসম্পন্ন

বটে কিন্তু সংক্রমণবিহীন। পক্ষমবাহিনী অবস্থায় ইহারা সিস্ট্ (cyst) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কীটাণু ডিম্বগুলি (cyst) জীবাণুবাহকের শরীরে কোনো বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে না কিন্তু অন্যের পক্ষে সংক্রমণতা জন্মায়। ইহাদের আকৃতি এবং অভ্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাহিরের আবহাওয়া ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য ডিম্বগুলির দেহের চতুর্দিকে আবরণ থাকে এবং বাঁচিবার জন্য উহাদের দেহের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য পোষণোপযোগী পদার্থ সঞ্চিত থাকে।

অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ-ফল

ক্ষত

পতনের ফলে শরীরের কোনো স্থানের চর্ম ছেঁৎলাইয়া গেলে ঐ স্থানে টিংচার আয়োডিন্ প্রয়োগ করিলে যদিও হয়ত সামান্য বেদনা, উত্তাপ, আরক্তিমতা, স্ফীতি এমনকি সামান্য জ্বরও হইতে পারে, কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষণ তিরোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু আয়োডিন্ প্রয়োগ না করিলে বা ঐ স্থানে ময়লা জমিলে অবিলম্বে পুঁজ উৎপন্ন হইবে, আরোগ্যলাভে কষ্ট পাইতে হইবে, এমনকি ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি গুরুতর উপসর্গও দেখা দিতে পারে। কোনো স্থান পচিয়া গেলে (sepsis) সেই স্থানে পুঁজোৎপত্তি হয়। বালকেরাও জানে যে আয়োডিন পচননিবারক (antiseptic) কার্য করে এবং পুঁজ জন্মিতে দেয় না। কিন্তু কি প্রকারে পুঁজ উৎপন্ন হয় গত শতাব্দী পর্যন্ত সে সম্বন্ধে মানুষের কোনো জ্ঞান ছিল না। বেদনা, উত্তাপ, আরক্তিমতা এবং স্ফীতি প্রভৃতি প্রদাহের নিদর্শন প্রাচীন হিন্দু এবং গ্রীকদিগের সময় হইতেও জানা ছিল। বস্তুতঃ সেলসাস (Celsus) নির্দেশ দেন বেদনা

(dolor), উত্তাপ (color), আরক্তিমতা (rubor) এবং স্ফীতি (tumor) প্রদাহের এই চারিটি প্রধান লক্ষণ, এবং এই মত সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগো নগরে লিষ্টার নামক একজন তরুণ অস্ত্রচিকিৎসক লক্ষ্য করেন যে সামান্য অস্থিভঙ্গ (simple fracture) প্রায় বিনা কষ্টে আরোগ্য হয়, অন্ততঃ মাংসপেশীর কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা আসে, কিন্তু উপসর্গজনিত অস্থিভঙ্গে (compound fracture)— অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় ভগ্নাস্থি চর্ম বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে— সেই সকল অবস্থায় প্রায়ই পুঁজ হয় ও তাহা বহুদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, এবং অনেক ক্ষেত্রে সাংঘাতিক উপসর্গ সকল উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার শ্বশুর তদানীন্তন স্বনামধন্য অস্ত্রচিকিৎসক সাইমের (Syme) নিকট ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন। এই জাতীয় রোগীর ক্ষতে পুঁজ উৎপাদন করিয়া প্রকৃতি রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কাজেই এই প্রকার পুজকে "শ্লাঘনীয় পুজ" (laudable pus) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই শ্লাঘনীয় পুজ উৎপাদন সত্ত্বেও যদি রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে উহা কাহারও দোষ নহে, রোগীরই দুর্ভাগ্য। লিষ্টার তাঁহার ছাত্রজীবনে এই শিক্ষাই পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগকেও তিনি এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন।

সেই সময় পারী নগরীতে লুই পাস্তর (Louis Pasteur) এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পাস্তর অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন না, এমনকি সাধারণ চিকিৎসাব্যবসায়ীও ছিলেন না, তিনি একজন রাসায়নিক। পাস্তর সেই প্রবন্ধে ঘোষণা করেন যে, যে জিনিসের প্রভাবে শর্করা-দ্রব গাঁজিয়া যায় (fermentation) তাহা বাতাসের মধ্যে নিহিত আছে।

বাস্তবিক ইহা একটি নিছক রাসায়নিক সংবাদ। কিন্তু এই ঘোষণার ফলে লিষ্টারের মনে এই চিন্তা জন্মিল যে, সাধারণ অস্থিভঙ্গে চর্ম ভেদ করিয়া অস্থি বাতাসের সংস্পর্শে আসে না, কিন্তু উপসর্গজনিত অস্থিভঙ্গে তাহা মাংস চর্ম প্রভৃতি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসে, অতএব বায়ুতে এমন কোনো জিনিস আছে যাহা উপসর্গজনিত অস্থিভঙ্গের ক্ষতে প্রবেশ করিয়া পুঁজ উৎপাদন করে। এইভাবে লিষ্টার পচন-নিবারক অস্ত্রবিদ্যার (antiseptic surgery) জন্ম দিয়াছিলেন। অস্ত্রোপচার মঞ্চে রোগীর চতুষ্পার্শ্বে বায়ুমধ্যস্থ অদৃশ্য শত্রুর ধ্বংসসাধনের মানসে লিষ্টার জলমিশ্রিত কার্বলিক এসিড ছড়াইয়া দেন। ১৮৭৮-খৃষ্টাব্দে জার্মানিতে রবার্ট কখ্ (Robert Koch) বলেন যে staphylococcus এবং streptococcus নামক জীবাণুই ক্ষতে পুঁজ সংক্রমণের কারণ। সংক্রামক জীবাণু ধ্বংসের অন্যান্য উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে লিষ্টার বায়ুমধ্যস্থ জীবাণুধ্বংসকারী কার্বলিক এসিড প্রেক্ষণপ্রণালী ধীরে ধীরে ত্যাগ করিলেন এবং অস্ত্রাদি, স্পঞ্জ, বন্ধনী সূত্র (ligature), ক্ষতবন্ধনী (dressings) এবং প্রত্যেক জিনিস যাহা ক্ষতের সংস্পর্শে আসিত সেই সমস্তই জলে ফোটাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবার অভ্যাস করিলেন। অস্ত্রোপচারের পূর্বে তিনি পরিষ্কার বহির্বাস পরিধান করিয়া হস্তাদি উত্তমরূপে সংক্রমণ-প্রতিষেধক দ্রব্যে ধৌত করিতেন। তাঁহার সহচরেরাও এবম্বিধ প্রণালী অবলম্বন করিতেন। তৎকালীন হাসপাতালের ক্ষতবন্ধন জন্য পরিচ্ছদাদি (dressing) গৃহস্থঘরের গৃহিণীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইত। তাঁহারা ব্যবহার্য পুরাতন জীর্ণবস্ত্র রোগীদিগের জন্য হাসপাতালে পাঠাইয়া দিতেন এবং সেই সকল বস্ত্রখণ্ড অধিকাংশ সময় ধৌত না করিয়াই ব্যবহার করা হইত।

লিষ্টারের এই নূতন প্রণালী অবলম্বনে অভূতপূর্ব ফল দেখা গেল। বিসর্প, সেপ্টিসিমিয়া, গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ যাহা সেই কালের হাসপাতালে উন্মুক্ত ক্ষতের নিত্য নৈমিত্তিক উপসর্গ ছিল সেই সকল রোগ সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছিল। লিষ্টারকে পচননিবারক অস্ত্রবিদ্যার (aseptic surgery) জনক আখ্যা দেওয়া হয়। লিষ্টারবাদ এক হিসাবে পাস্তুরবাদের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ফরাসী গণতন্ত্র প্রেসিডেণ্টের মারফতে পাস্তুর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকীতে তাঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করেন, এবং সেই সভায় লণ্ডন এবং এডিনবরার রাজকীয় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে লিষ্টার কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে পাস্তুরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন।

আমরা পুঁজ (pus), পচন (sepsis), পচন-নিবারক (antiseptic) এবং অপচনীয় (asepsis) শব্দসকল উল্লেখ করিয়াছি। পুঁজ একপ্রকার ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ, ইহার উপাদান তরল এবং জীর্ণ তন্তু, লসিকা (lymph) এবং মৃত বা অপকৃষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা। প্রদাহিত তন্তুর উপরে জীবাণুর কার্যের ফলে এবং অপকৃষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা হইতে উৎপন্ন ferment দ্বারা পরিপাকের ফলে পুঁজ উৎপন্ন হয়। পুঁজ যে কেবল জীবিত জীবাণুর কার্যের ফল তাহা নহে, মৃত জীবাণু, টার্পিন তৈল বা অন্য কোনো উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করাইয়াও পুঁজ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং জীবাণুবর্জিত পুঁজও সম্ভব। যখন কোনো ক্ষত পুঁজ-উৎপাদনকারী জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ক্ষতমধ্যে জীবাণু সকল বর্ধিত হইতে থাকে তখন সেই জাতীয় ক্ষতকে জীবাণু-বিষাক্ত ক্ষত বলে। যে পদার্থ দ্বারা রোগ-উৎপাদক জীবাণু সকল বিনষ্ট হয় সেই পদার্থকে পচননিবারক পদার্থ (antiseptic) বলে। বিষাক্ত জীবাণু হইতে মুক্ত অবস্থাকে অপচনীয় (asepsis) অবস্থা বলে।

পচননিবারক ঔষধ টিংচার আয়োডিন প্রয়োগের ফলে পতনজনিত যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যস্থ জীবাণুসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষতকে জীবাণুর প্রভাব হইতে মুক্ত করে এবং পুঁজ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থান প্রদাহিত হওয়া এবং সেইস্থানে বেদনা, উত্তাপ, আরক্তিমতা, স্ফীতি, জ্বর এবং সঞ্চালনশক্তিলোপ প্রভৃতি লক্ষণসকল বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। যদি ক্ষতে জীবাণুনাশক আয়োডিন অথবা পচননিবারক অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় তাহা হইলে পুঁজ-উৎপাদক জীবাণুসকল পুঁজ জন্মাইবে এবং রোগ-উৎপাদক অন্যান্য জীবাণু-সকল, যথা ধনুষ্টংকার-উৎপাদক জীবাণু বিদ্যমান থাকিলে ধনুষ্টংকার রোগ জন্মাইবে।

স্ফোটক বা ব্রণ (Furuncle)

সম্ভবতঃ ইহাই মানুষের জীবাণুঘটিত সর্বাপেক্ষা সাধারণ রোগ। Staphylococcus নামক এক প্রকার বর্তুলাকার জীবাণু কর্তৃক এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই জীবাণু বহুদিন পর্যন্ত ধূলা, পরিচ্ছদ ইত্যাদির মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে। অপরিষ্কার চর্ম ইহার প্রিয় বাসস্থান। এই জীবাণু লোমকূপের মধ্য দিয়া অথবা অপরিষ্কার নখ দ্বারা চুলকাইলে বা পরিচ্ছদাদির ঘর্ষণে কোনো স্থানে ক্ষত হইলে চর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। লোমকূপের ছিদ্র, ময়লা বা শুষ্ক চর্ম দ্বারা আবদ্ধ হইলে সেই স্থানে জীবাণুর বাসের সুবিধা হয় বিশেষতঃ যখন স্বেদনির্গমন অত্যধিক হয়। লোমকূপে জীবাণু প্রচুর খাদ্য, রস ও উত্তাপ, অন্ধকার প্রভৃতি পোষণোপযোগী সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যখন কতক বংশবৃদ্ধি হয় তখন জীবাণুগুলি উত্তেজনা সৃষ্টি করে, ফলে সেই স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং যে পর্যন্ত লোমকূপের নিম্নে সামান্য পরিমাণ পুঁজ ঘনীভূত না হয়, সে পর্যন্ত

লোমকূপের চতুষ্পার্শ্বে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে পুঁজ অল্পাধিক স্থানে বিস্তৃত হইয়া স্ফীতি উৎপাদন করে এবং লোমকূপ আবদ্ধ থাকার জন্য পুঁজ বাহিরে আসিতে পারে না, সুতরাং প্রদাহিত স্থানে আভ্যন্তরিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়া বশতঃ সংজ্ঞাবহ ধমনী (sensory nerve) প্রসারিত হইয়া বেদনা সৃষ্টি করে। পুঁজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে আভ্যন্তরিক চাপও বৃদ্ধি পায়, ফলে পুঁজ চর্মের উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়া ফোড়া পাকিয়া উঠে এবং পরিশেষে বিদীর্ণ হইয়া পুঁজ নিঃসৃত হয়। স্ফোটক জন্মিবার সর্বাপেক্ষা সাধারণ স্থান লোমকূপ, বিশেষতঃ যখন চর্ম শুষ্ক বা লোমকূপের ছিদ্রসকল ময়লায় আবদ্ধ থাকে অথবা চর্ম বিদীর্ণ হয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার অভাবই এই রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ।

এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যখন ফোড়া পাকে বা পাকিবার উপক্রম হয় তখন প্রায়ই অপরিষ্কার আঙ্গুল অথবা নখের অগ্রভাগ কিম্বা রুমাল দ্বারা পেষণ করিয়া উহা হইতে পুঁজ বাহির করিয়া দিবার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফলে সাংঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে। প্রদাহিক রস সঞ্চিত থাকার জন্য স্ফোটকের চতুষ্পার্শ্বস্থ তন্তু অনেকটা শ্লথ থাকে এবং উহা চাপিলে নিকটবর্তী তন্তু, রক্ত এবং লসিকানালীর মধ্যে জীবাণু সজোরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ফলে জীবাণু সর্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া সর্বব্যাপী সংক্রমণ উৎপন্ন করিতে পারে। স্বভাবতঃ নির্বিষ ও অনাক্রমক staphylococcus জীবাণু এইভাবে আক্রমণশীল জীবাণুর ন্যায় কার্য করিতে সক্ষম হয়। চর্মের স্বাভাবিক প্রতিরোধ করিবার যে প্রবল ক্ষমতা আছে, প্রদাহ জন্য তাহা নষ্ট হয়।

জীবাণু সংক্রমণে যে স্ফোটক সাধারণ একটি লোমকূপে উৎপন্ন হয়, হঠকারিতার সহিত হস্তক্ষেপ না করিলে তাহা মৃদু প্রকৃতিরই থাকে। কিন্তু

একই সময়ে বহু লোমকূপে স্ফোটক জন্মিলে কার্বাঙ্কল (carbuncle) সৃষ্টি হয় এবং তীব্র বিষ উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে।

বিসর্প (Erysipelas)

বিসর্প রোগে চর্মে অতি সত্বর প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ষ্ট্রেপটো-কক্কাস নামক বর্তুলাকার তীব্র বিষসম্পন্ন ও আক্রমণাত্মক জীবাণু এই রোগ সৃষ্টি করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই তীব্র বিষসম্পন্ন জীবাণু প্রায়ই বহুদিন পর্যন্ত নির্দোষভাবে গলমধ্যে ও শ্বাসনালীর ঊর্ধ্বদেশে অবস্থান করে। কিন্তু যখনই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কালে ইহাদের সমাবেশ হয়, তখনই ইহারা তীব্র বিষাক্ততার পরিচয় দিতে বিলম্ব করে না।

সূতিকা জ্বর

সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতিদিগের যে জ্বর হয় তাহা Strepto-coccus জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এই জ্বরকে সূতিকা জ্বর (puerperal fever) বলা হয়। অনেক সময় ধাত্রী বা চিকিৎসকের দোষে প্রসূতির জীবন বিপন্ন হয়। প্রসবের পরে গর্ভফুল বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে জরায়ুতন্তু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকে তখন জীবাণুর আক্রমণের পক্ষে ঐ ক্ষত বিশেষ সাহায্য করে। এই ক্ষতিগ্রস্ত তন্তু ষ্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণুর উপযুক্ত স্থান। ধাত্রী অথবা চিকিৎসক যদি সর্দি অথবা গলপ্রদাহ রোগগ্রস্ত হন এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া প্রসব কার্যে রত হন তাহা হইলে জীবাণু প্রসবপথে সংক্রামিত হয়। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

সেমেলভাইস (Semmelweis) নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক একজন হাঙ্গেরীবাসী যুবক প্রফেসার ক্লাইনের (Klein) অধীনে থাকিয়া প্রথম প্রসূতিবিভাগ পরিচালনা করিতেন। দ্বিতীয় প্রসূতিবিভাগের কার্য ধাত্রী সেবিকা প্রভৃতি স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত হইত। একবার তাঁহার বিভাগে সূতিকা জ্বরে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য ছাত্রদিগের সহিত শত শত মৃতদেহ পরীক্ষা করেন কিন্তু সূতিকাজ্বরে মৃত্যুর কারণ এবং দ্বিতীয় প্রসূতিবিভাগের অল্প মৃত্যুর কারণ কোনোটাই নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে তাঁহার বন্ধু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক কোলেচকা (Kolelschka) মারা যান। শবব্যবচ্ছেদের সময় একজন ছাত্রের অসাবধানতা বশতঃ ছুরিকার আঘাতে তাঁহার হস্ত ক্ষত হয়, ফলে রক্ত বিষাক্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়া সেমেল-ভাইসের মনে প্রশ্ন উদিত হইল, সূতিকা জ্বর কি রক্ত-বিষাক্ততা হইতে উৎপন্ন হয়? মৃতদেহের বিষ ছাত্রের ছুরির আঘাতে উৎপন্ন ক্ষতের মধ্য দিয়া কোলেচকার শরীরের রক্ত বিষাক্ত করিয়াছিল। সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতির প্রসবপথে বিরাট ক্ষত উৎপন্ন হয়। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন এই ক্ষতস্থান দূষিত করিবার মত মৃতদেহের বিষ তিনিই এবং তাঁহার ছাত্রগণ শবব্যবচ্ছেদাগার হইতে বহন করিয়া লইয়া যান। দ্বিতীয় প্রসূতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ধাত্রী এবং সেবিকারা শবব্যবচ্ছেদ করিতেন না। তথায় মৃত্যু সংখ্যাও কম হইত। এই তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে যাহাদিগের প্রসবদ্বারের অভ্যন্তর প্রদেশ বহুবার চিকিৎসক এবং ছাত্রদিগের দ্বারা পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হয় তাহাদের মৃত্যুসংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। পরবর্তী শবব্যবচ্ছেদের পরে তিনি সাবান দ্বারা, পরে

ক্লোরিন মিশ্রিত জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ হস্ত ধৌত করিলেন এবং যে পর্যন্ত মৃতদেহের গন্ধ সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত না হইল সে পর্যন্ত তিনি নানা ভাবে হস্ত ধৌত করিয়া পরে প্রসব কার্য সম্পন্ন করিলেন। ক্লোরিন দ্বারা ধৌত প্রণালী মে মাসের শেষভাগে আরম্ভ করা হয়। সূতিকা জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা এপ্রিল মাসে শতকরা ১৮ জন ছিল। জুন মাসে ২ জন এবং জুলাই মাসে ১ জন মাত্র হইয়াছিল। পরবর্তী কালে তিনি আবিষ্কার করিলেন যে কেবল মৃতদেহের বিষই মৃত্যুর কারণ নয়, পচা ক্ষত হইতে উৎপন্ন বিষ এবং ঐ বিষ-সংক্রামিত অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদিও মৃত্যুর জন্য দায়ী। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি এবং পরিচ্ছদাদি বিশেষ ভাবে ক্লোরিন মিশ্রিত জলে ধৌত করিয়া ব্যবহার করাতে মৃত্যুর হার সর্বনিম্নস্তরে আসিয়াছিল। মৃতদেহের বিষে সূতিকা জ্বরের উৎপত্তি ও বিশেষভাবে ক্লোরিন ব্যবহারে মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস এই তথ্য সেমেলভাইস কর্তৃক আবিষ্কৃত হইবার ১৮ বৎসর পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট লিষ্টার সর্বপ্রথম পচননিবারক প্রণালী অবলম্বন করিয়া অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। ইহারই ৫ দিন পরে অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট অস্ত্রোপচারের সময় সেমেলভাইসের হস্তের কোন স্থান কাটিয়া যায় এবং তাহার ফলে রক্ত বিষাক্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যাহাকে সেমেলভাইস পচা দেহের দূষিত পদার্থ (putrid animal matter) বলিতেন তাহাকেই আধুনিক জীবাণুতত্ত্ববিদেরা haemolytic streptococcus বলেন। এই জীবাণু হইতেই সূতিকা জ্বর জন্মে।

সর্দি

আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক জীবাণু তত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অতি সাধারণ সর্দি রোগের (common cold) কারণ সম্বন্ধে

এখনও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। ইনফ্লুয়েঞ্জার ন্যায় সাধারণ সর্দি-উৎপাদক জীবাণুও অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাণু (ultramicroscopic virus)। এই রোগে নাসিকা, গলদেশ ও শ্বাসনালীর ঊর্ধ্বাংশের প্রদাহ প্রভৃতি ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ সকল দেখা যায়। সর্দি এত সাধারণ ও পরিচিত রোগ যে চিকিৎসায় বা চিকিৎসা ব্যতিরেকে ইহা ২।৩ দিনের মধ্যেই তিরোহিত হয়। প্রকৃত চিকিৎসার অভাব বশতঃ ইহার সুদূরপ্রসারী অনিষ্টের পরিমাণ আমরা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারি না। সর্দি উপেক্ষা করিলে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হইতে পারে। ইহাতে রোগী শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় না। সিনেমা গৃহে, ট্রাম গাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, সভা সমিতি ইত্যাদি জনপূর্ণ স্থানে রোগীর হাঁচি কাশির সহিত অসংখ্য তীব্র বিষাক্ত জীবাণু সকল জনতার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং অন্য ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হয়।

নিউমোনিয়া

একটি সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি। সাধারণতঃ দুই প্রকার জীবাণু হইতে নিউমোনিয়া রোগ জন্মে। এক প্রকার ডিম্বাকৃতি একত্রে অবস্থিত জীবাণুযুগল নিউমোকক্কাস (pneumococcus) নামক জীবাণু প্রকৃত নিউমোনিয়া উৎপাদন করে। আরও এক প্রকার জীবাণু নিউমোনিয়া বা তৎসদৃশ লক্ষণাবলী উৎপাদন করে, তাহাকেও নিউমোনিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। নিউমোকক্কাসজনিত নিউমোনিয়াকেই সাধারণতঃ নিউমোনিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

অন্য প্রকার জীবাণু হইতে যে সকল নিউমোনিয়া হয়, তাহাদিগকে ঐ রোগ উৎপাদক জীবাণু অনুসারে অভিহিত করা হয়, যেমন যক্ষ্মাজীবাণু-জনিত নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জাজনিত নিউমোনিয়া, প্লেগজীবাণুজনিত

নিউমোনিয়া ইত্যাদি। নিউমোনিয়ার জীবাণু (pneumococcus) বিদ্যমান থাকিলেই যে নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে তাহা নহে, কোনো অনিষ্ট না করিয়া তাহারা গলমধ্যে অবস্থান করিতে পারে। দেখা গিয়াছে যে অন্ততঃ শতকরা ২০ জন সুস্থ ব্যক্তির মুখ ও গলমধ্যে নিউমোনিয়া জীবাণু বসবাস করে। আমরা নিউমোনিয়া জীবাণুজাত নিউমোনিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

তরুণ নিউমোনিয়ায় ফুসফুসের সমস্ত পিণ্ডটি (lobe) আক্রান্ত হয়। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি ফুসফুসের সম্পূর্ণ অংশ এবং অন্য ফুসফুসের কতক অংশ আক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। নিউমোনিয়া সেপটিসিমিয়া জাতীয় রোগ। ইহাতে রক্তে অসংখ্য জীবাণু এবং প্রবল বিষাক্ততা বিদ্যমান থাকে। নিউমোনিয়া রোগীর নিকট হইতে সরাসরি ভাবে অন্যলোকের দেহে জীবাণু সংক্রামিত হওয়া সম্ভব কিন্তু তাহা সাধারণ ঘটনা নহে। জীবাণুবাহী ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় অন্য লোকের সংক্রমণের কারণ হয়, তাহার কফ প্রভৃতি পদার্থ হইতে জীবাণু অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। নিউমোনিয়া শিশু, বৃদ্ধ ও মদ্যপায়ীদের পক্ষে খুবই মারাত্মক।

যক্ষ্মা

এই রোগ ভারতে ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। যক্ষ্মাজীবাণু (microbacterium tuberculosis) এক প্রকার দণ্ডাকৃতি উদ্ভিদ-জাতীয় জীবাণু। ইহা এত সূক্ষ্ম যে হাজার গুণ বর্ধিত করিলে ইহাকে একটি তণ্ডুল কণার মত দেখায়। এই জীবাণু মানবজাতির অন্যতম প্রধান শত্রু। যক্ষ্মারোগে মানুষের মৃত্যুহার সকল মৃত্যু সংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ। অন্যান্য রোগে মৃত লোকদিগের মধ্যেও শতকরা ৪০ হইতে ৫০ জনের ভিতরে যক্ষ্মারোগের অস্তিত্ব দেখা যায়। পশু জগতেও ইহার বিস্তৃতি দেখা

যায়। বন্য জন্তু অপেক্ষা গৃহপালিত জন্তুই অধিক আক্রান্ত হয়। সমস্ত যুগেই ইহার অস্তিত্ব ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তু যাহারা পৃথিবীতে ১০ কোটি বৎসর পূর্বে ছিল তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের মধ্যেও যক্ষ্মা রোগের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। যক্ষ্মাজীবাণুর প্রতিকূল আবহাওয়া প্রতিরোধের প্রবল শক্তি আছে, এবং অনুকূল অবস্থায় বহু বৎসর পর্যন্ত ইহা মানবদেহের বাহিরে উগ্র অবস্থায় জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়। রোগীর কাশের সহিত যে শ্লেষ্মা নির্গত হয় তাহা হইতেই যক্ষ্মাজীবাণু অন্য লোকের ফুসফুসে সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ রোগীর টাটকা শ্লেষ্মা হইতে, কিম্বা শুষ্ক শ্লেষ্মা যখন ধূলিতে পরিণত হয় তখন শ্বাসের সহিত ধূলি মিশ্রিত যক্ষ্মাজীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করে। যক্ষ্মাজীবাণু মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে শিশুরা যক্ষ্মাক্রান্ত হয়। শিশুদের গ্রীবাগ্রন্থি, অস্থি এবং সন্ধি সকল বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়।

আন্ত্রিক সংক্রামক ব্যাধি

দেহমধ্যে মহাস্রোত (অন্নবহনালী) জীবাণু সংক্রমণের একটি বিরাট আধার। পানীয় জলের মধ্য দিয়া অনেক জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এই আন্ত্রিক রোগ উৎপাদনকারী প্রায় সকল জীবাণুই জল দ্বারা বাহিত হয় (water-borne)। এই শ্রেণীর ব্যাধির মধ্যে আমরা তিনটি রোগের আলোচনা করিব, বিসূচিকা (কলেরা), আমাশয় (dysentery) এবং আন্ত্রিক জ্বর (টাইফয়েড)।

বিসূচিকা

বিসূচিকা জীবাণু ক্ষুদ্র বক্রদণ্ডাকৃতি। উহারা দূষিত খাদ্য, জল ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। সাধারণতঃ মল

মূত্রাদি হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কিম্বা মক্ষিকা দ্বারা বাহিত হইয়া খাদ্য ও পানীয়ের সংস্পর্শে আসিয়া উহাকে দূষিত করে। পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে সেই স্থানস্থ অম্লধর্মাবলম্বী পাচক রস জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করিতে পারে। পরিপাক প্রণালীর সময়ে বহু জীবাণু বিনষ্ট হয়। কিন্তু যদি কোনো কারণে অম্লরস কম নিঃসৃত হয় কিম্বা প্রচুর পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহার অম্লত্ব হ্রাস পায়, অথবা যদি উপবাসের সময় জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহা হইলে উহারা বিনা বাধায় পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ ক্ষারধর্মী রসের সহিত মিশ্রিত হয় ও অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিসূচিকা জীবাণুর আক্রমণের পরিধি খুব সীমাবদ্ধ। জীবাণুগুলি প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে অবস্থান করে, কখনও রক্তমধ্যে প্রবেশ করে না। অন্ত্রের প্রথম অংশ হইতে পিত্ত নালীর মধ্য দিয়া পিত্তথলিতে উপস্থিত হয় সুতরাং প্রায়ই পিত্তথলি জীবাণুতে পূর্ণ থাকে। জীবাণু এবং উহার বিষ অন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া প্রচুর মলাদি উৎপন্ন করে এবং ঐ মলের সহিত অন্ত্রগাত্রস্থ বিমুক্ত কোষসকল খণ্ড খণ্ড আকারে বিদ্যমান থাকে। পিত্ত নিঃসরণ স্থগিত হয় বলিয়া মলের রং সাদা জলের মত দেখায়। অতি সত্বর দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে জল নষ্ট হয়, ফলে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি, মাংসপেশীর আক্ষেপ, প্রস্রাব বন্ধ, হিমাঙ্গ অবস্থা, মূত্র এবং রক্ত প্রবাহ রুদ্ধ হয়। এ সমস্তই প্রবল বিষাক্ততার লক্ষণ।

প্রবাহিকা (আমাশয়)

বিসূচিকার ন্যায় প্রবাহিকা রোগও জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রবাহিকা জীবাণু দুই প্রকার, কতকগুলি উদ্ভিজ্জ (ব্যাসিলারি) এবং কতকগুলি জঙ্গম জাতীয় (এমিবিক)। উদ্ভিজ্জ জীবাণু দণ্ডাকৃতি।

জঙ্গম জীবাণুর নাম এমিবা। ইহা এককোষবিশিষ্ট আদিম প্রাণীবিশেষ। উভয় জাতীয় জীবাণুই খাদ্য ও পানীয়ের সহিত অন্ত্রে প্রবেশ করে। উদ্ভিজ্জ প্রবাহিকা জীবাণু অনাক্রমণশীল কিন্তু তীব্র বিষসম্পন্ন।

আন্ত্রিক জ্বর

আন্ত্রিক জ্বর (টাইফয়েড) উৎপাদনকারী টাইফয়েড জীবাণু একাধারে প্রবল আক্রমণশীল এবং তীব্র বিষসম্পন্ন। সাধারণতঃ কোনো পশু বিসূচিকা, প্রবাহিকা বা আন্ত্রিকজ্বরে আক্রান্ত হয় না। টাইফয়েড বা বিসূচিকা জীবাণু পশুদেহে প্রবেশ করাইলেও আন্ত্রিকজ্বর বা বিসূচিকার মত লক্ষণ প্রকাশ পায় না, যদিও বিষের প্রভাবে পশুর মৃত্যু ঘটিতে পারে।

সাধারণতঃ বিসূচিকার ন্যায় টাইফয়েড জীবাণুও খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। কোন রোগবশতঃ কিম্বা প্রচুর জল পানের ফলে পাকস্থলীর অম্লরসের পরিমাণ যখন কম হয় তখন জীবাণু পাকস্থলীর মধ্য দিয়া অন্ত্রে প্রবেশ করে। দূষিত জল, দুগ্ধ এবং খাদ্যসামগ্রী হইতে জীবাণু সংক্রামিত হইয়া রোগ সৃষ্টি করে। ক্ষারধর্মাবলম্বী পিত্তের সংস্পর্শে অন্ত্রের মধ্যে জীবাণুগুলি বর্ধিত হয়। জীবাণুগুলি Peyer's patches অথবা solitary folliclesএর মধ্য দিয়া লসিকা গ্রন্থি, মেসিন্টারিক গ্রন্থি ও প্লীহার মধ্যে প্রবেশ করে। রোগের গুপ্তাবস্থায় এই কার্য সংঘটিত হয় এবং শিরঃশূল, অসুস্থতা প্রভৃতি উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জীবাণুগুলি প্লীহা ও লসিকা নালী হইতে নির্গত হইয়া রক্তপ্রবাহে উপনীত হয়। রক্তস্রোত জীবাণুগুলিকে সমস্ত অন্ত্রাদির নিকটে বহন করিয়া লইয়া যায়

এবং জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অথবা তৃতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে জীবাণুগুলি মলমূত্রের সহিত দেহ হইতে নির্গত হয়। বহু সংখ্যক জীবাণু রক্তপ্রবাহের মধ্যে যে বিষ নিঃসৃত করে, তাহা হইতেই লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

পরীক্ষা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রায় সকল রোগীরই জ্বরের প্রথম সপ্তাহে রক্ত হইতে, পরবর্তী সময়ে মল হইতে এবং তারও পরবর্তী সময়ে মূত্র হইতে টাইফয়েড জীবাণু পৃথক্ করা যাইতে পারে। টাইফয়েড জ্বরে প্রবল বিষাক্ততা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। উপসর্গসকল বিভিন্ন প্রকারের ও সাংঘাতিক হয়।

তুলনামূলক ভাবে দেখিলে বিসূচিকার আক্রমণ হঠাৎ আরম্ভ হয় এবং ইহার বিস্তৃতি ও পরিণতি অতি দ্রুত। যদি রোগের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে তাহা হইলে রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে। অন্যপক্ষে আন্ত্রিক জ্বরের গুপ্তাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং রোগ আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। রোগের অগ্রগতি মৃদু অথচ দৃঢ় এবং আরোগ্য-লাভও ক্রমশঃ ধীরে ধীরে হইতে থাকে।

আন্ত্রিক জীবাণুজনিত রোগসকল বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিক অন্নবহনালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের অন্নবহনালী অনবরত জীবাণুতে পূর্ণ থাকে। এই জীবাণু আমাদের জন্মগ্রহণের কিছুদিন পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্যের মলের সর্বসমেত ওজনের অর্ধেকেরও বেশি কেবলমাত্র জীবাণুতে পূর্ণ। এই সকল জীবাণুর মধ্যে অধিকাংশই ব্যাসিলাস কোলাই (B coli) নামক জীবাণু। বিসূচিকা, আন্ত্রিক জ্বর প্রভৃতি রোগ-উৎপাদক জীবাণুর সংখ্যা বিঃ কোলাইর অনুপাতে অতি নগণ্য, কিন্তু যেমন জনাকীর্ণ শহরে কয়েকটি অপরাধীই প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারে সেইরূপ এই স্বল্প

সংখ্যক রোগ-উৎপাদক জীবাণু দেহের ক্ষতি এমন কি মানবের মৃত্যুসাধন ঘটাইতে সক্ষম।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অন্ত্রমধ্যে স্বভাবতঃ বর্তমান বিঃ কোলাই জীবাণু কি রোগ উৎপাদন করে? কোনো কোনো সময়ে ইহারা রোগ উৎপাদন করে বটে, কিন্তু উহারা আমাদিগের খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের বিশেষ সহায়ক। আমাদিগের উদ্ভিদজাত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রচুর cellulose আছে যাহা থাকার জন্য পাচক রস খাদ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে অনেক সময় অসমর্থ হয়। অন্ত্রমধ্যস্থ জীবাণু ঐ celluloseকে পরিপাক করিয়া আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করে।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া জীবাণু এক প্রকার জঙ্গম জীবাণু। ইহা আণুবীক্ষণিক এক-কোষ-বিশিষ্ট প্রাণীবিশেষ। ইতিপূর্বে যত প্রকার জীবাণুর বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা সকলেই রোগীদেহে কিম্বা জীবাণুবাহকের দেহে বর্তমান থাকে এবং আক্রমণ করিবার পূর্বে দেহের বাহিরে কোথাও অবস্থান করে। অনেক সময় সুযোগের অপেক্ষায় তাহাদিগকে মানব-দেহের বাহিরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে হয়। পক্ষান্তরে ম্যালেরিয়া-জীবাণু জীবদেহের বাহিরে মুহূর্তমাত্র অবস্থান করিতে অসমর্থ। তাহাদিগকে হয় মানবের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে কিম্বা মশকীর দেহে থাকিতে হয়। এই উভয় আশ্রয়ে তাহারা বংশবৃদ্ধি করে। এক মানব হইতে অন্য মানবে কিম্বা এক মশকী হইতে অন্য মশকীতে যাইবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। মশকী হইতে মানব এবং মানব হইতে মশকীই তাহাদের পরিভ্রমণের পথ। মশকী হইতে মানবে যাইতে না পারিলে মশকীর স্বল্প জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য প্রকৃতি মশকীকেই ইহার অন্যতর বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছে। বলা আবশ্যক, মশক কখনও রক্তপান করে না, ইহারা উদ্ভিজ্জভোজী ; মশকী প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জভোজী হইলেও রক্ত তাহাদের অতি প্রিয়, বিশেষতঃ ডিম্ব প্রসব করার পূর্বে । কবি বলিয়াছেন—

বুড়ো বুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকতো,
বুড়ো ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়ী ছিল ভারি শাক্ত।

ম্যালেরিয়া ইটালীয় ভাষায় 'mal area' অর্থাৎ দূষিত বাতাস হইতে উৎপন্ন। জলাজমির দূষিত বাতাস হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ইহাই সে দেশের লোকের ধারণা ছিল। যদিও মশকশাবকের জন্মস্থান জলাভূমি, তথাপি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এখনও অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণাও অদ্ভুত দেখা যায়। অনেকে বলেন—ম্যালেরিয়াদুষ্ট গ্রামে গিয়াছিলাম বটে কিন্তু পুষ্করিণীতে স্নান বা তাহার জল পান করি নাই, সকল কার্যের জন্য নলকূপের জল ব্যবহার করিয়াছি। এতদ্দ্বারা তাঁহারা ইহাই বুঝাইতে চান যে ঐ সকল স্থানের জলই দূষিত, ঐ জল ব্যবহার করিলেই ম্যালেরিয়া হয়। জল মশকশিশুর জন্মস্থান মাত্র, এবং একমাত্র মশকীই যে রোগী হইতে অন্য সুস্থ দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করিয়া লইয়া যায়, এই জ্ঞান অনেক শিক্ষিত লোকেরও নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লাভেরান্ (Laveran) মানুষের রক্তে সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করেন। ইহার ১৭ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রোলাণ্ড রস্ (Roland Ross) দেখান যে মশকী রোগী হইতে সুস্থ ব্যক্তিতে এই জীবাণু বহন করিয়া লইয়া যায়। এই আবিষ্কার পানামা খালের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মিসর দেশে
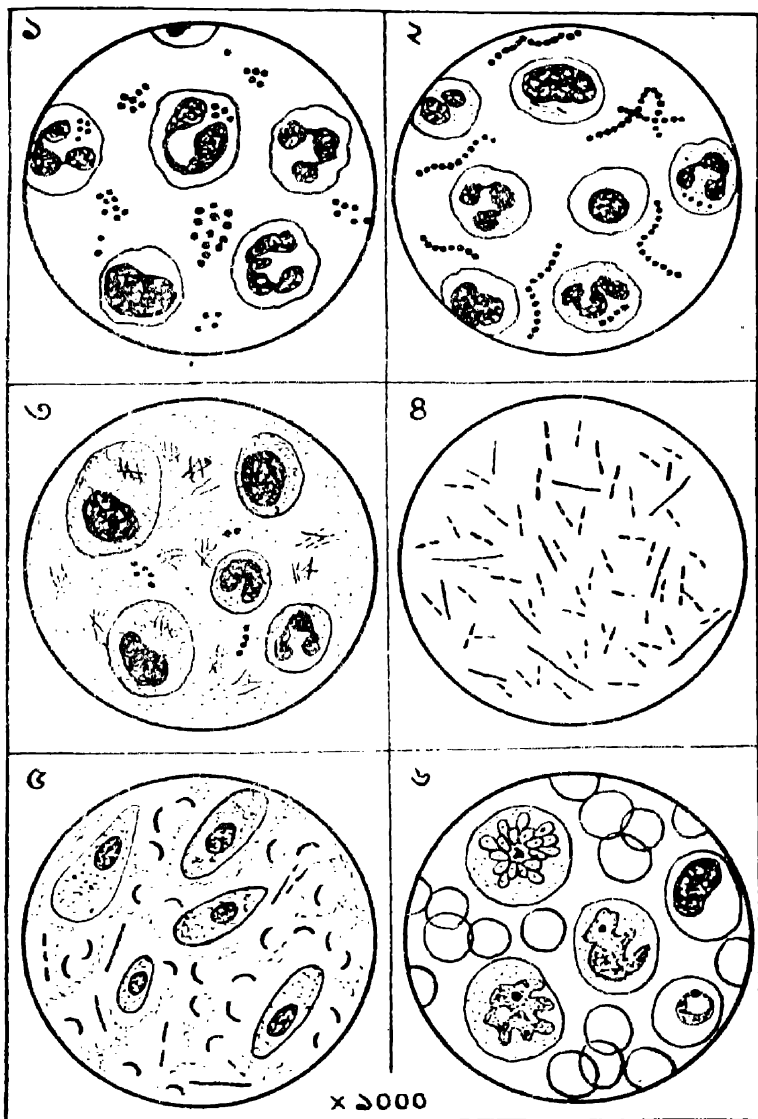
বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। পর পৃষ্ঠায় চিত্র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

চিত্রব্যাখ্যা

(১) পুঁজ মধ্যস্থ staphylococcus নামক জীবাণু ক্ষুদ্র কণাদলের মত একত্রে স্থানে স্থানে রহিয়াছে। বৃহদাকার শ্বেতকণিকার (leucocyte) জীবকোষ ও তাহার মধ্যবস্তু (nucleus) দেখা যাইতেছে। ইহারাই আমাদের অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সৈনিকের কাজ করে। মধ্যে একটি সৈনিক চারটি staphylococcus গ্রাস করিয়াছে দেখা যাইতেছে।

(২) পুঁজ মধ্যস্থ streptococcus কণার সারি। এই জীবাণু সাধারণতঃ মালার আকারে বর্তমান থাকে।

(৩) যক্ষ্মারোগীর কফমধ্যস্থ দণ্ডাকৃতি যক্ষ্মাজীবাণু। পাঁচটি জীবকোষও দেখা যাইতেছে।

(৪) দণ্ডাকৃতি টাইফয়েড জীবাণু (বিশুদ্ধ আবাদ হইতে)।

(৫) মলমধ্যস্থ বক্রদণ্ডাকৃতি বিসূচিকাজীবাণু, দেখিতে কমার (,) ন্যায়। পাঁচটি অন্ত্রগাত্রের কোষ দেখা যাইতেছে।

(৬) রক্তমধ্যে ম্যালেরিয়া জীবাণু। ক্ষুদ্র গোলাকার শূন্যগর্ভ চক্রগুলি লোহিত রক্তকণিকা। দক্ষিণে একটি জীবকোষ। বাকী চারটি ম্যালেরিয়া জীবাণু।

রবার্ট কখ্ কর্তৃক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিসূচিকা জীবাণু আবিষ্কারের পর ঐ দেশে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শেষ বারের মত বিসূচিকা মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পর ৪৩ বৎসরে সমগ্র মিসর দেশে বা ইওরোপে বিসূচিকা রোগ দেখা যায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশ! ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকা সমানভাবে এই দেশকে যুগযুগান্তর ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।

জীবাণুর বিভিন্ন প্রকৃতির আক্রমণ ও বিষাক্ততার ফলে যে সকল বিভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা নির্দেশ করিবার জন্য জীবাণুগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতেছে।

১। **অনাক্রমক ও বিষবিহীন জীবাণু**— যেমন অন্ননালী ও শ্বাসনালীতে স্বভাবতঃ যে সকল জীবাণু থাকে। ইহারা প্রায়ই কোনো রোগ জন্মায় না। সচরাচর ইহাদের আক্রমণের কোনো শক্তি নাই এবং স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো বিষ উৎপাদন করে না। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি, যেমন B. coli, কোনো ক্ষতি করা দূরে থাকুক আমাদের খাদ্যাদির অতি প্রয়োজনীয় পরিপাক কার্যে সহায়তা করে।

২। **অনাক্রমক কিন্তু বিষাক্ত জীবাণু**— যেমন স্টেফাইলো-কক্কাস, যক্ষ্মা জীবাণু, বিসূচিকা জীবাণু, প্রবাহিকা জীবাণু প্রভৃতি। সাধারণতঃ স্টেফাইলোকক্কাস স্ফোটক জন্মায় এবং ঐ স্ফোটক হইতে বিষ শোষিত হইয়া জ্বর, শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে পারে। কিন্তু স্ফোটকস্থ জীবাণু অন্য স্থান আক্রমণ করে না কিম্বা রক্তেও প্রবেশ করে না। ইহারা নিজস্থানে থাকিয়াই বিষ উৎপাদন করে এবং ঐ বিষ রক্তে ও শরীরের অন্য স্থানে গমন করে। যক্ষ্মা জীবাণুও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে। বিসূচিকা এবং প্রবাহিকা রোগে জীবাণুগুলি যথাক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্রে এবং বৃহদন্ত্রে

অবস্থান করে। ইহারা কখনও রক্ত বা গভীরতর তন্তুতে প্রবেশ করে না কিন্তু প্রবল বিষাক্ততা উৎপাদন করে এবং প্রায়ই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করে।

৩। **আক্রমণকারী কিন্তু নির্বিষ জীবাণু**— Anthrax জীবাণু anthrax রোগ জন্মায়। সাধারণতঃ এই রোগে চর্ম আক্রান্ত হয় এবং জীবাণু রক্তে প্রবেশ করিয়া অতি শীঘ্র এমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে তাহাদিগের সংখ্যাধিক্যই সকল অঙ্গের বিকলতা সাধন করে। সংখ্যাধিক্যের তুলনায় বিষ উৎপাদন অতি সামান্য।

৪। **একাধারে আক্রমণকারী ও বিষাক্ত জীবাণু**— যথা স্ট্রেপ্টোকক্কাস, নিউমোকক্কাস এবং টাইফয়েড জীবাণু। বিসর্প, সূতিকা-জ্বর, অথবা অস্ত্রোপচারকালীন উৎপন্ন ক্ষত হইতে রক্তবিষাক্ততা প্রভৃতি অবস্থায় স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুর আক্রমণ ও বিষাক্ততার ফল সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড জীবাণু রোগের প্রথম লক্ষণ বিকাশ হইবার পূর্বেই রক্তে বিদ্যমান থাকে এবং ঐ জীবাণু হইতে উৎপন্ন বিষই রোগের কারণ।

জীবাণু সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের ধারণা

অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে লেভেনহক (Leeuweenhoek) ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে জঙ্গম জীবাণু (protozoa) এবং ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থাবর জীবাণু (bacteria) আবিষ্কার করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জীবাণুই যে রোগের কারণ তাহা আবিষ্কৃত হয়। জীবাণুমাত্রেই এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাহা দৃষ্টি-গোচর নহে, সেই হেতু মনে করা যাইতে পারে যে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ আজ হইতে ১০০ বৎসরের পূর্বে কোনও দেশে রোগ-জীবাণুর অস্তিত্ব

সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আর্য ঋষিগণের জীবাণু সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

সুশ্রুত ব্রণরক্ষা প্রসঙ্গে বলেন (সু-সূ-১৯।২০)—মহাবীর্যসম্পন্ন হিংসা-প্রিয় রক্ষোগণ ও মহাদেবের অনুচরগণ রোগীর রক্ত মাংস ও লোম আক্রমণ করে। সেই কারণে প্রাণরক্ষার জন্য ব্রণ রোগী সর্বদা লোম নখ কর্তন ও বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান দ্বারা পবিত্র থাকিবে। রক্ষঃ বা রাক্ষস বলিতে গেলে আমাদের একটি প্রকাণ্ডকায় জন্তু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশালকায় জীব কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মধ্যে প্রবেশ করে? সুতরাং মনে হয় যে ব্রণরাক্ষস ও মহাদেবের অনুচরগণই জীবাণু। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার আয়ুর্বেদীয় প্রণালী বর্তমান যুগের স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনুরূপ। সুশ্রুত আরও বলেন, মহাবীর্যবান্ রক্ষোগণ রক্তমাংসপ্রিয়ত্ব হেতু শোণিত লোভে ব্রণিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়। রক্তমাংসই যদি তাহাদের অতি প্রিয় হয় এবং তাহারা যখন মহাবীর্যবান্, তখন সামান্য ব্রণমধ্যস্থ পুঁজরক্তে বিশেষ লোলুপ কেন হইবে? বর্তমান বিজ্ঞান মতে পচনপ্রাপ্ত রক্তমাংসই জীবাণুবৃদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র (culture medium). সুতরাং জীবাণুরূপী রক্ষোগণের ব্রণমধ্যস্থ রক্তমাংসই অধিক প্রিয়।

অথর্ববেদে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রক্ষঃ পিশাচের কথা বলা হইয়াছে। অদৃশ্য রক্ষঃ পিশাচ কিরূপ? এই জীব অদৃশ্য হইবে কিরূপে? অথর্ববেদোক্ত ও আয়ুর্বেদোক্ত রক্ষঃ পিশাচ ও ক্রিমি বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবাণু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এক্ষণে আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে রোগ-উৎপাদনকারী রাক্ষসাদির যে সকল বর্ণনা আছে তাহাদের সহিত বর্তমান জীবাণুশাস্ত্রের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

তক্‌মন্—তক্মন অথর্ববেদোক্ত দৈত্যবিশেষ। ইহা জ্বররোগের মূর্তরূপ এবং মহাবীর্যবান্। তক্মনকে তাপজনক অর্থাৎ জ্বররূপী, অগ্নিরূপী কল্পনা করা হইয়াছে। তক্মন বর্ণনায় তাহাকে শীতরূপ সবিরাম জ্বর, এক দিন পর পর, দুই দিন পর পর এবং তৃতীয়ক জ্বর রূপে নমস্কার করা হইয়াছে—(অথর্ববেদ ১।২৫।৪ ; ৫।২২।২,৬,১৩ ; ৬।২০)। আরও লক্ষণের মধ্যে শীর্ষশোক (মস্তকে পীড়া), পৃষ্ঠমায়া (পৃষ্ঠে বেদনা), কম্প, জ্বালা, তাপ ইত্যাদি সর্বশরীরের পীড়াদায়ক জ্বররূপে নমস্কার করা হইয়াছে— (অথর্ববেদ—১।২৫।১-৪ ; ৫।২২।৭,১০,১২,১৩ ; ৭।১১৬।১ ; ১৯।৩৯।১০) । হরিদ্বর্ণকারক পাণ্ডুরোগজনক হিসাবে তাহাকে হরিতস্য দেব ও বরুণের পুত্ররূপে নমস্কার করা হইয়াছে (অথর্ববেদ—১।২২।৪ ; ১।২৫।২-৩ ইত্যাদি)। শরৎকাল, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল ইত্যাদি ঋতু ভেদে তক্মনের প্রাবল্য সম্বন্ধেও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় (অথর্ব বেদ—৭।১১৬।২ ; ৯।৮।৬ ; ১৯।৩৪।১০, ৩৯।১০)।

অথর্ববেদে জ্বররূপী তক্মন-দৈত্য সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে তাহা বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্যালেরিয়া জ্বর।

অথর্ববেদোক্ত তক্মনের বর্তমান নাম ম্যালেরিয়া জীবাণু বলা যাইতে পারে। অথর্ববেদোক্ত হ্রূড়ু ও হরিমান দৈত্য তক্মনের নামান্তর (অথর্ববেদ ১।২৫।২-৩, ১।২২।৪, ৫।২২।২, ৬।২০।৩, ৯।৮।৯, ৯।১৩।৯, ১৯।৪৪।২)।

কর্কটী—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বর্ণিত কর্কটী রাক্ষসীর বর্ণনা ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করিলে বিসূচিকার আধুনিক জীবাণুশাস্ত্র ও মহামারী তত্ত্বের (Epidemiology) সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উৎপত্তি প্রকরণে ৬৮ সর্গঃ হইতে ৮৪ সর্গঃ পর্যন্ত ১৭ অধ্যায়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ

বিসূচিকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি শ্লোকের পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

হিমগিরির উত্তরে কর্কটী নাম্নী এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসী বাস করিত। ইহার আরও দুইটি নাম বিসূচিকা ও অন্যায়বাধিকা। ইহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় এবং কার্যসকলও অতি ভয়ানক। ঐ কৃশকায়া রাক্ষসী দেখিতে শুষ্ক বিন্ধ্যাটবী সদৃশ। উদর ভরণের উপযুক্ত আহার না পাওয়ায় ঐ বিপুলকায়া রাক্ষসীর জঠরানল সর্বদাই বাড়বানলের ন্যায় অতৃপ্ত থাকিত। একদা রাক্ষসী ক্ষুধার্ত হইয়া চিন্তা করিল, সমুদ্র যেরূপ নদী-সকল গ্রাস করে, আমি যদি সেইরূপ এই জম্বুদ্বীপস্থ সমস্ত জন্তু এক নিঃশ্বাসে গ্রাস করি, তাহা হইলে ক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কর্কটী সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ভগবান ব্রহ্মা কৃপান্বিত হইয়া তথায় আগমনপূর্বক এইরূপ বর প্রদান করিলেন,

"তুমি অতিসূক্ষ্ম মায়া অবলম্বনপূর্বক কুভোজী কুকর্মরত কুদেশবাসী ব্যক্তিদিগকে সর্বদা হিংসা করিবে। তুমি বায়বীয় পরমাণুতুল্য হইয়া জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস অবলম্বনে তাহাদের অপান দেশ হইতে তাহাদের হৃদয় পর্যন্ত আক্রমণ করিবে এবং হৃৎপদ্ম সন্নিহিত প্লীহা যকৃৎ ও বস্তি-শিরাদির পীড়া উৎপাদনপূর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। তুমি বাত লেখাত্মিকা (বাত লক্ষণযুক্তা) বিসূচিকা ব্যাধি হইয়া গুণবান্ কিম্বা গুণহীন উভয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিতে পারিবে।"

অনন্তর অদ্রিশিখরসমানা অতি মলিনা সেই রাক্ষসী অঞ্জন ও জলদ রেখার ন্যায় ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। প্রথমে সেই রাক্ষসী মেঘ-সদৃশী, পরে বৃক্ষশাখারূপিণী, তাহার পর পুরুষপ্রমাণা, তদনন্তর হস্তমাত্রাকৃতি, তাহার পর মাষশিম্বীর ন্যায়, অনন্তর স্থূল সূচীর সদৃশ, পরে কৌষেয় বস্ত্র সীবনোপযোগী সূচীবৎ সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল। তখন

পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। শিখরসমাকায়া সেই রাক্ষসী ক্রমে সংকল্পকল্পিত ভূধরের ন্যায় অণুপ্রমাণ (অতি সূক্ষ্ম) হইয়া গেল এবং নভোগর্তের ন্যায় নীলিমাময়ী ঐ রাক্ষসী নিঃশব্দভাবে অদৃশ্য সূচীময় সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরে সতত অবস্থান করিতে লাগিল। মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত বাসনামাত্র সার চিদাভাসরূপে ঐ রাক্ষসীর জীবসূচী সূক্ষ্ম দীপকিরণের ন্যায় অদৃশ্য ও তীক্ষ্ণ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন দুষ্টবুদ্ধি সেই রাক্ষসীর জীবসূচী বিবশাঙ্গ, ক্ষীণ ও স্থূল জনগণের অন্তরে অতিবিসূচিকা ব্যাধিরূপে এবং ক্ষুদ্র দেহ, সুস্থ ও সুখী জনগণের হৃদয়ে অন্তরবিসূচিকা রূপে প্রবেশ করতঃ মনোরথ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। সে প্রাণীগণের অন্তঃস্থিত স্নায়ু পথে, ব্যভিচারাদি দুষ্ট যোনিতে, পাংশু পাণ্ডুরিত শুষ্ক নদীতে, হস্ত পাদাদি রেখারূপ নদীখাতে, সূক্ষ্ম রোম রেখারূপ জীর্ণ তৃণে, সৌভাগ্যলক্ষণহীন অঙ্গে, কান্তিহীন স্থানে, মক্ষিকা-সঙ্কুল দুর্গন্ধজাত দূষিত প্রদেশে, বিল্বাদি বৃক্ষ বিবর্জিত অপবিত্র দেশে, মৃত নরাদির অস্থিরূপ গ্রন্থিসঙ্কুল স্থানে, বাত্যাবিকম্পিত প্রদেশে, নির্মল আত্মনিষ্ঠ নীহারবৎ পরসন্তাপহারী সাধুগণ কর্তৃক বিবর্জিত স্থানে, অপবিত্র বসনধারী অশিষ্ট জনের সঞ্চরণ স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মহারামায়ণে বর্ণিত কর্কটীই বিসূচিকা জীবাণু, এবং উহা আক্রমণের বর্ণিত কারণ বর্তমান জীবাণুবিজ্ঞানের মতের সদৃশ।

জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে চরকে উল্লিখিত আছে যে (চ-চি ৩।৮-১০) দক্ষযজ্ঞে মহাদেবের ক্রোধাগ্নি হইতে জ্বররূপী বীরভদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। বীরভদ্র মানব এবং অন্য প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে। বর্তমান মতে জ্বর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং বীরভদ্র একালের জ্বর-উৎপাদনকারী জীবাণু।

চন্দ্রদেবের যক্ষ্মা সম্বন্ধে চরকে (চ-চি ৮।২) উল্লিখিত আছে যে

দক্ষের ক্রোধ মূর্তিমান হইয়া নিঃশ্বাসরূপে চন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যক্ষ্মা অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জন্মিয়াছিল। ক্রোধ দক্ষদেহ হইতে নিঃশ্বাসরূপে বহির্গত হইয়া চন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বর্তমানে আমরা জানি, যক্ষ্মা জীবাণু শ্বাস-প্রশ্বাস পথে দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মা জীবাণুকে দক্ষের মূর্তিমান ক্রোধের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ব্রণরাক্ষস সম্বন্ধে সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। শুভ্র বস্ত্রাদি ব্যবহার ও ঘন ঘন শ্মশ্রু নখ কর্তন প্রভৃতি ব্রণরাক্ষস প্রতি-ষেধের ব্যবস্থা বর্তমান যুগে asepsis। সুশ্রুত যাহা ব্রণরাক্ষস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহা বর্তমান যুগে স্ট্রেপটো বা স্টাফাইলোকক্কাস ইত্যাদি পূঁজ-উৎপাদনকারী জীবাণু।

বালগ্রহগণের স্বরূপ সম্বন্ধে সুশ্রুত বর্ণনা করিয়াছেন (সু-উ ২৭।৪) যে, নয়টি বালগ্রহ যথা— স্কন্দগ্রহ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপুতনা, শীতপুতনা, মুখমণ্ডিকা ও নেগমেষ বালককে বাহির হইতে আক্রমণ করিয়া বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন করে। ইহারা যে জীবাণুরই প্রতীক তাহা তাহাদের আক্রমণ প্রণালী হইতে জানা যায়। যে সকল গৃহ লক্ষ্মীভ্রষ্ট ও নিঃস্ব, এবং যাহারা বালকের যত্ন লয় না সেই গৃহের বালকেরই এই সকল গ্রহজনিত (জীবাণুজনিত) রোগ জন্মে (সু উ ৩৭।৩)।

কৃত্যারাক্ষসী—সুশ্রুত বলেন, শস্ত্রকর্ম করণান্তর রোগীকে আশ্বস্ত করিবে এবং রক্ষোঘ্ন দ্রব্যের ধূপ দ্বারা ব্রণে ধূপ দিবে, রক্ষোঘ্ন মন্ত্র দ্বারা কৃত্যা ও রক্ষো গ্রহের কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে (সু-সূ-৫।১৩)। এস্থলে টীকাকার ডল্লন কৃত্যার অর্থ করিয়াছেন—কুপিত মন্ত্রির অভিচার কর্ম-জনিতা রাক্ষসী কৃত্যা নামে অভিহিত।

কৃত্যা যে কেবল শস্ত্রকর্মের পর ঐ স্থান দূষিত করে তাহা নহে। সুশ্রুত বলেন (সু-সূ ৬।১৮) কখনও বা ধাতুসকল ব্যাপন্ন না হইলেও কৃত্যা, অভিশাপ, রক্ষঃ, ক্রোধ ও অধর্ম দ্বারা জনপদ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন চরক ও সুশ্রুত ভূত, প্রেত, পিশাচ ও বিবিধ রক্ষঃদ্বারা রোগোৎপত্তির বৃত্তান্তও বর্ণনা করিয়াছেন (চ-সূ ২০।৩, সু-সূ ৩১।৩০)।

আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে ঐ সকল রাক্ষসাদি বর্তমান শাস্ত্রমতে জীবাণু নির্দেশ করে। রাক্ষসাদি রূপক স্বরূপ। রাক্ষসাদি ভিন্ন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে জীবাণু সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়। রক্তজ ক্রিমি প্রসঙ্গে চরক বলেন (চ-বি ৭।৬) রক্তজ ক্রিমি অতি সূক্ষ্ম বৃত্তাকার, পাদহীন। কেহ বা এত সূক্ষ্ম যে তাহারা চক্ষুর অদৃশ্য। তাহাদের প্রভাব কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও পক্ষ্মের উধ্বাংশ। ব্রণ গত হইলে হর্ষ, কণ্ডু, তোদ ও সংস্পর্শন। অতি প্রবৃদ্ধ হইলে ত্বক শিরা স্নায়ু মাংস ও তরুণাস্থি ভক্ষণ করে। সুশ্রুতের মতেও (সু-উ ৫৪।১১) রক্তজ ক্রিমিসকল অদৃশ্য। অথর্ববেদেও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ক্রিমির এবং তাহাদের বীর্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে (অথর্ববেদ-২।৩১।২ ; ২।৩২।৩)। বর্তমান বিজ্ঞান মতে রক্তজ ক্রিমির নাম স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

পাপ ও গ্রহবৈগুণ্যজাত রোগ—সুশ্রুত বলেন মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন এবং রোগীর বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার, এই সকল কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, রাজযক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) এবং ঔপসর্গিক রোগসমূহ এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় (সু-নি ৫।২৬)। বর্তমান সংক্রমণবিজ্ঞান ইহার সমর্থন করে।

অথর্ববেদে সূর্যরশ্মির জীবাণুনাশক কার্যের বর্ণনাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অথর্ববেদ বলেন—

উদ্যন্নাদিত্যঃ ক্রিমীন্ হন্তু নিম্রোচন্ হন্তু রশ্মিভিঃ। ২।৩২।১

অর্থাৎ, আদিত্য উদয় প্রাপ্ত হইলে রশ্মিব্যাপনশীল নিজ কিরণ দ্বারা ক্রিমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উৎসূর্যো দিব এতি পুরো রক্ষাংসি নিজুবন্।
আদিত্য পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা॥ ৬।৫৩।১

অর্থাৎ, সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া উপদ্রবকারী রক্ষঃ পিশাচাদির ধ্বংস করে। এমন কি উদয়াচল প্রদেশ পর্যন্ত আদিত্য সর্বপ্রাণীর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রক্ষঃ পিশাচ ধ্বংস করে।

দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল প্রকার ক্রিমি অর্থাৎ জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা যে সূর্য রশ্মির আছে তাহাতে প্রাচীন ও বর্তমান বিজ্ঞান একমত।

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ